বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৩

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলকাতা-৯

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিণ্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রিট / কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

আঠারো টাকা

HIMSITAL
By
BAREN GANGOPADHYAY

Nabapatra Prakashan
8 Patuatola Lane/Cal-700 009

প্রফুল্ল রায়

প্রিয়বরেষু

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সবে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল অরুণ, চমকে উঠল। কাগজের ব্যক্তিগত কলমে ছোট একটা বিজ্ঞাপন। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। লিখেছে, 'মৃত্যুর পর দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাই।'

ভুল পড়ছি না তো? কাগজটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে অরুণ। গতকাল একটু বেশি রাত-জাগা হয়ে গেছে। ওর বহুকালের পুরনো বন্ধু সমীরের বিবাহবার্ষিকী ছিল। সেখান থেকে ফিরে শুতে শুতে প্রায় দুটো হয়ে গিয়েছিল। কি জানি, রাত জাগার জন্য অক্ষরগুলি অন্যরকম দেখাচ্ছে নাতো! আবার পড়ল অরুণ। না, সেই একই লেখা। বিজ্ঞাপনদাতা বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, 'মৃত্যুর পর দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাই।'

আশ্চর্য! কার এমন অদ্ভুত মনোবাসনা জাগল! মিশরের লোকেরা মৃত্যুর পর দেহকে মমি করে রাখে, কিন্তু আমাদের দেশেও মমি করে রাখার বাসনা জাগল কার! নাকি কোন বিকৃত মস্তিষ্ক লোক এই ধরনের একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এখন অলক্ষ্যে বসে হাসছে। অরুণ সত্যি সত্যি কেমন গোলোকধাঁধায় পড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কৌতুকও। কৌতূহল দমিয়ে রাখা কঠিন ব্যাপার। পাগলই হোক, আর যেই হোক, ব্যাপারটার মধ্যে বেশ রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

মনে মনে ঠিক করে ফেলল, যেভাবেই হোক বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ফলে, ওর প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিজ্ঞাপনের একটা উত্তর দেওয়া।

অরুণ গলা তুলে ডাকল, রঘু! এই রঘু!

রঘু বাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল, জবাব দিল, যাই বাবু।

এই ফাঁকে আবার বিজ্ঞাপনটা পড়ল অরুণ। না, ওটা যে এমনি এমনি দেওয়া হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। নির্ঘাৎ কোন মোটিভ রয়েছে পেছনে। এমনও হতে পারে, কেউ হয় তো অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পড়ে এরকম একটা বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কি সেই পরিস্থিতি!

—ডাকছিলেন বাবু?

—হুঁ, এদিকে আয়, প্যাড দে। জরুরি একটা চিঠি ছাড়তে হবে এখুনি।

রঘু প্যাড আর কলম এগিয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ চায়ের কাপের দিকে চোখ পড়ায় ওর সেই স্বভাবসুলভ কাঁধ-ঝাঁকানো মুদ্রাদোষটি প্রকাশ করে এক গাল হাসে, এঁ হেঁ, আপনাকে নিয়ে আর পারি না দাদাবাবু!

—কেন রে, কি করেছি?

—চায়ের কাপ যেমন দিলাম, তেমনি পড়ে রইল যে। এরপর কি জল করে খাবেন?

—ওহ-হো! চা খাই নি বুঝি, এ সময় চা খাওয়ার কথা কি মনে থাকে!

রঘু কেমন দুর্বোধ্য চোখে তাকায়।

—এই দেখ না, কী অদ্ভুত একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কাগজে।

রঘু আর একটু কাছে এগোয়, কি বিজ্ঞাপন দাদাবাবু?

অরুণ গলা নিচু করে বলে, পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ থাকে, আর মানুষের কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছে হয়।

—কি হয়েছে, বলুন না দাদাবাবু? আগ্রহে মেঝেতেই বসে পড়ে রঘু।

অরুণ বলে, তার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি তোকে, বল তো মানুষ মরে গেলেই কি সব শেষ হয়ে যায়?

রঘু কেমন ঘোলাটে চোখে তাকায়, এঁজ্ঞে এই সকালবেলা ও কী কথা দাদাবাবু? কে মরেছে?

—কেউ মরে নি। তবে জানতে চাইছি, কেউ যদি মরে, সেখানেই কি তার শেষ?

প্রশ্নটা এবারও পরিষ্কার হল না রঘুর কাছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

অরুণ বলল, ঠিক আছে, মনে কর একটা লোক মারা গেল; লোকটা যদি হিন্দু হয় তা হলে তো তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে, আর যদি সে মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়, তা হলে তাকে গোড় দেওয়া হবে, তাই না? কিন্তু তারপর?

রঘু আরো গুটিয়ে যায়, কি হয়েছে বলুন না দাদাবাবু?

জ্ঞানী বুদ্ধের মতো হাসে অরুণ, আসলে কি জানিস, পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আছে তারা পোড়ায় না, কবরও দেয় না।

—তা হলে! কি করে তারা?

—রেখে দেয়।

—রেখে দেয়!

—হ্যাঁ রে, রেখে দেয়। মৃত্যুর পরও কিছু একটা হতে পারে মনে করে তারা মৃতদেহটাকে অনেক কায়দা-কসরত করে রেখে দেয়। হাজার হাজার বছর আগে মরে গেছে, কিন্তু এখনো তার দেহটা রেখে দেওয়া আছে, এমন ঘটনাও ঘটে। সে সব গল্প পরে শুনিস, এখন এই দেখ, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।

রঘু অল্পস্বল্প পড়তে পারে। কাগজ নিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

অরুণই পড়ে বুঝিয়ে দিল, লিখেছে মরে যাওয়ার পর দেহটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব যদি কেউ নিতে পারেন, তাহলে যোগাযোগ করুন

—এ কী অদ্ভুত কথা দাদাবাবু! কিন্তু আপনি যেন ও সবের মধ্যে যাবেন না। জীবনে অনেক শক্ত শক্ত কাজ করেছেন, কিন্তু দোহাই দাদাবাবু, ওর মধ্যে ঢুকবেন না। চোখে কেমন উৎকণ্ঠা গড়ায় রঘুর।

অরুণ আবার একটু হাসে, ঢোকাঢুকির কি আছে। তবে বিজ্ঞাপনটা কে দিল, কেন দিল জানতে ইচ্ছা করে না ?

রঘু জানে, দাদাবাবুর ওই এক দোষ, কোথাও কোন রহস্যের গন্ধ পেলেই আর ওকে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু এরকম একটা মারাত্মক ব্যাপারের মধ্যে দাদাবাবু যাবেন, ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হয় ওর।

আবার বলল, দোহাই দাদাবাবু, ওসব মড়া-ফড়া ব্যাপারের মধ্যে না যাওয়াই ভাল ! কি করতে কি হয়ে যাবে, শেষটায় ঝামেলার আর শেষ থাকবে না।

ততক্ষণে চিঠি লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল অরুণের। জল দিয়ে মুখ আটকিয়ে রঘুর হাতে তুলে দিল। নে, পোস্ট করে দিস। আর যাবার আগে এক কাপ চা খাইয়ে যাস। বুঝলি ?

—কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না দাদাবাবু। আপনি এখানে একা থাকেন, আমার মন বলছে ভাল হচ্ছে না।

রঘুর কাঁধে হাত রেখে একটা ঝাঁকি দিল অরুণ। হাসল, আমি এখানে একা থাকি কি রকম ? আমার গার্জেন হিসেবে তুই তো আছিস। যা ওঠ, এক কাপ চা খাইয়ে চিঠিটা ফেলে দিয়ে আয়। যা।

রঘু উঠল। দাদাবাবুকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। মাথায় একবার যখন ঢুকেছে, শেষ না দেখে আর ছাড়বে না। তবু শেষবারের মতো আর একবার চেষ্টা করে রঘু, বলে, আমার কথাটা কিন্তু ভেবে দেখবেন দাদাবাবু। আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ, কিন্তু ওসব জিন-পরীর ব্যাপার আমিও কিছু কিছু জানি।

—জিন-পরী ! এর মধ্যে আবার ওসব এল কি করে ? কৌতুকে তাকায় অরুণ।

—এল না ! আপনিই তো বললেন, মানুষ মরে গেলেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। যতক্ষণ না দেহটার সংগতি হচ্ছে, ততক্ষণ তো আত্মাটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

—তাই বুঝি! আত্মাফাত্মা দেখতে কি রকম রে? দেখেছিস কখনো? প্রশ্ন করে অরুণ।

রঘু গম্ভীর গলায় উত্তর দেয়, আত্মা নেই বলবেন না। চোখে দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু আছে। অনেক জিনিসই আমরা চোখে দেখি না দাদাবাবু, কিন্তু আছে। আচ্ছা, আপনিই বলুন না, বাতাস তো চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তা কি নেই বলবেন?

—ওরে ববাস! তুই তো বেশ লজিক শিখে গেছিস! ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম, মড়া মানুষ নিয়ে মাথা ঘামাব না। কিন্তু বিজ্ঞাপন তো কোন মড়া মানুষ দিতে পারে না। জ্যান্ত মানুষই দিয়েছে। সেই জ্যান্ত মানুষটাকেই একবার চোখের দেখা দেখব। তুই যা এবার।

রঘু কি ভাবল, চলে গেল।

অরুণ আবার বিজ্ঞাপনটা পড়ে নিল। কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না, কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে লোকটার। কোন সম্পত্তি-টম্পত্তি ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপার নয় তো! নাকি তার চেয়েও আরো বড় কোন রহস্যজনক চক্র কাজ করছে পেছনে!

একটু উত্তেজিত হয়ে নড়েচড়ে বসে অরুণ। এমনও তো হতে পারে, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে কারবার করে এমন কোন লোকের কীর্তি এটা। তান্ত্রিক! ধুত, তান্ত্রিক হয় কি করে! তান্ত্রিক হলে মৃতদেহ হাতে পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারত, কিন্তু এ যে নিজেরই দেহটাকে মৃত্যুর পর রক্ষা করতে চায়। তার মানে, বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে দেখা না হলে কোন রহস্যই পরিষ্কার হবে না। অরুণ ছটফট করে ওঠে আর ঠিক এই সময়ই হঠাৎ ওর অধ্যাপক পট্টনায়কের কথা মনে পড়ে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে পুরী থেকে ফেরার পথে সেই পট্টনায়কের সঙ্গে বড় অদ্ভুতভাবে ওর আলাপ হয়ে গিয়েছিল। অরুণের মনে পড়ল ভদ্রলোক গত কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে পাগলের মতো পরলোকতত্ত্ব

নিয়েই গবেষণা করছেন। কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন ওর মধ্যে কে জানে! মানুষের কত রকম যে মাথায় আসে!

মনে পড়ল, সেবার পুরী গিয়েছিল ও বেড়াতে। ফেরার সময় একটা ফার্স্ট ক্লাস কুপে অরুণই ছিল একমাত্র যাত্রী। ট্রেনটা বেশ চলছিল, কিন্তু কটকে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লেট করতে লাগল। পুরী থেকেই ঘুমুতে ঘুমুতে ফিরছিল অরুণ। কটকে ওর ঘুম ভেঙে গেল। আর প্ল্যাটফরমেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে কৌতুকে ও জানালা খুলে বাইরের দিকে চোখ পেতে বসে ছিল।

প্ল্যাটফরমে বেশ ভিড়। সবাই ছুটোছুটি করছে দেখতে পেল অরুণ। এমন সময় হাল্কা ছিপছিপে এক ভদ্রলোক খুব উদ্বিগ্নভাবে ওর জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পরনে সাদা ফিনফিনে ধুতি আর পাঞ্জাবী, মাথায় ঝাকড়া চুল, ঘাড় অবধি ঝোলান। কপালে একটা চন্দনের টিপ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

অরুণ দেখল, ভদ্রলোকের হাতে একটা হালকা স্যুটকেসও রয়েছে। হয় তো ভিড়ের ট্রেনে অন্য কোন কামরায় জায়গা করে নিতে পারেন নি।

—দাদা কি কলকাতা যাচ্ছেন? ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো? উত্তর দিয়েছিল অরুণ।

—আমাকে একটু সাহায্য করবেন। এত ভিড়, কোথাও উঠতে পারলাম না। অথচ আমার কলকাতায় না গেলেই নয়। এই ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।

অরুণ অসুবিধায় পড়ল। অপরিচিত লোককে, এভাবে দরজা খুলে ভেতরে আসতে দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। লোকটার আপাদ মস্তক আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল অরুণ। পরে বলল, কণ্ডাকটর গার্ড রয়েছে, তাকেই বলুন না।

—বলেছি। প্যাসেঞ্জার যদি আপত্তি না করেন তা হলে ওর

আপত্তি নেই। দয়া করে দরজাটা একটু খুলুন না। আমি অধ্যাপক উমেশ পট্টনায়ক। হয় তো নামও শুনে থাকবেন। পরলোক নিয়ে আমি অনেক দিন ধরে গবেষণা করছি। কালই যদি কলকাতায় না পৌঁছতে পারি, আমার সব আয়োজনই বৃথা যাবে। প্লিজ দাদা, দরজাটা খুলুন। আমাকে তুলে নিন।

—পরলোকতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন! ভীষণ কৌতূহল জেগেছিল অরুণের।

—দরজাটা খুলুন না দাদা। আমি আপনাকে সব বলব। প্লিজ। ভীষণ বিপদে পড়েই আপনাকে বিরক্ত করছি।

এরপর অরুণের কি যে হল, দরজা খুলে দিয়ে ভদ্রলোককে ভেতরে তুলে নিয়েছিল। নিয়ে আবার লক করে দিয়েছিল দরজা।

—কি ব্যাপার বলুন তো?

ভদ্রলোক স্যুটকেস খুলে খালি বার্থের ওপর একটা চাদর বিছিয়ে নিলেন। ট্রেনে আর যাতায়াত করা যাবে না মশাই। এই দেখুন না, দুপুরে কলকাতা থেকে একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির, কাম শার্প, ক্যালকাটা। তা টিকিটের জন্য কত অনুনয়-বিনয় করলাম, দিলে না। ফলে সেকেণ্ড ক্লাসেরই একটা টিকিট কেটে নিয়েছি। কিন্তু কামরায় কামরায় কী ভিড়, বাপস!

—কলকাতায় আপনার এমন কি দরকার পড়ল? না হয় কালই যেতেন।

ভদ্রলোক হাওয়া বালিশ ফুলিয়ে বার্থের ওপর শুয়ে পড়লেন, আর বলেন কেন, ন' বছরের একটা ছেলের সন্ধান পেয়েছি।

অরুণ বুঝতে পারল না, তাকিয়ে থাকল।

ভদ্রলোক তাঁর রহস্য ভাঙলেন, ন' বছরের সেই ছেলেটা তার পূর্বজন্মের কিছু কিছু কথা স্মরণে আনতে পারছে। কালকের মধ্যেই কলকাতা না পৌঁছতে পারলে ছেলেটা হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে, তাই ছুটে যাওয়া।

অরুণ কেমন ঘোলাটে চোখে তাকাল, পূর্বজন্মের কথা সত্যি সত্যি কেউ বলতে পারে নাকি ?

—আপনার সন্দেহ আছে ?

—না. মানে ওসব কথা লোক-মুখেই শুনেছি, চোখে কোনদিন দেখিনি, তাই।

—তাই অবিশ্বাস করছেন। ঠিক আছে কোনদিন কটকে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—কটকে !

—হ্যাঁ কটকে, এই আমার ঠিকানা। একটু সময় নিয়ে আসবেন।

ভদ্রলোক একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিয়েছিলেন অরুণের দিকে।

কার্ডটা খুঁজলে এখনো হয় তো পাওয়া যেতে পারে। অরুণের মনে পড়ল, ভোরবেলা হাওড়ায় পৌঁছে ভদ্রলোক শান্তভাবে তাঁর স্যুটকেস নিয়ে নেমে গেলেন। ব্যাস, আর কোন দিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয় নি অরুণের।

বিজ্ঞাপনের ব্যাপার নিয়ে সেদিন খুব উত্তেজনার মধ্যেই কাটল ওর। রহস্য যাই থাক, বিষয়টার মধ্যে রোমাঞ্চেরও গন্ধ আছে। আলমারি ঘেঁটে সেই পরলোকতত্ত্ববিদ অধ্যাপক পট্টনায়কের ভিজিটিং কার্ডটাও ও খুঁজে বার করল। কার্ডটা হাতে পাওয়ার জন্য ও পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটি হাতে আসার পর মনে হল, পরলোক বা জন্মান্তরবাদের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনদাতার হয় তো কোন সম্পর্কই নেই। মিছিমিছি অধ্যাপক পট্টনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করা। ভাবল, আগে বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশ্য জেনে নিতে হবে। পরে যদি প্রয়োজন হয় তখন পট্টনায়কের সঙ্গে

যোগাযোগ করা যেতে পারে। যত্ন করে আবার কার্ডটাকে রেখে দিল অরুণ।

তারপর বিজ্ঞাপনদাতার কাছ থেকে কোন উত্তর আসে কিনা তার জন্য অপেক্ষা করা। একদিন, দু'দিন, তিন দিন পার হয়ে গেল। হাজারটা কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে বিজ্ঞাপনের কথাটা প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল অরুণ, এমন সময়, অরুণ হিসেব করে দেখল, কাঁটায় কাঁটায় আট দিন পর একটা সুদৃশ্য এনভেলপ। হ্যাঁ, ওরই নাম ঠিকানা রয়েছে। কিন্তু কভারে প্রেরকের কোন ঠিকানা নেই, নামও নেই।

আগ্রহে চিঠিটা খুলে ফেলে অরুণ। আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর। আশ্চর্য, এ যে সেই বিজ্ঞাপন-দাতারই উত্তর।

উত্তেজনায় পড়তে শুরু করে অরুণ।

মহাশয়,

আমার বিজ্ঞাপনের উত্তরে আপনার চিঠিখানা পেয়েছি। চিঠিতে আপনি আপনার বিষদ পরিচয় দেন নি, কিন্তু আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাছাড়া যে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, সেই দায়িত্ব গ্রহণে আপনার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা কতটুকু তাও জানান নি। এই অবস্থায় কোন আলোচনাই সম্ভব নয়, দুঃখিত। তবু যদি প্রয়োজন মনে করেন, বিষদ বিবরণ জানাবার জন্য যে কোনদিন আমাকে ফোন করতে পারেন। ফোনে আলোচনা করার পরই আপনার আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইতি

সুভদ্রাদেবী

চিঠিটা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ল অরুণ। বিজ্ঞাপনদাতা তাহলে মহিলা। এবং খুবই সতর্ক। কেননা চিঠিটা টাইপ করা। হাতে লেখেন নি। হাতের লেখা হলে ভদ্রমহিলার চরিত্র বা মেজাজের

কিছুটা হয় তো আঁচ করে নিতে পারত ও ব্রতীশের কাছ থেকে। ব্রতীশের কথাই এ সময় মনে পড়ল ওর।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, চিঠিটা যিনি দিয়েছেন তিনি তো মহিলা না হয়ে পুরুষও হতে পারেন। সুভদ্রাদেবী নাম দিয়েছেন, কিন্তু ওটাই যে আসল নাম, কে বলবে! হয় তো ক্যামোফ্লেজ করার জন্যই ওরকম একটা নামে চিঠিটা ছেড়েছেন। হয় তো নিজেকে প্রথমেই খুলে ধরতে চান না।

অরুণ ফোন নাম্বারের দিকে তাকাল, ফোর ফোর একসচেঞ্জ। অর্থাৎ, টেলিফোন ডাইরেকটরি নিয়ে ঘাঁটতে লাগল, এই তো, এই তো; পার্ক সার্কাসের দিকেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ফোন নম্বর যখন পাওয়া গেছে, তখন ঠিকানা বার করে ফেলা এমন কিছু কঠিন নয়। ডাইরেকটরি ঘেঁটে ঠিকানা পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু একসচেঞ্জে যোগাযোগ করলে নিশ্চয়ই ঠিকানাটা বার করে ফেলা যায়।

কিন্তু অত করার কি দরকার, এখনি একবার সুভদ্রাদেবীকে ফোন করে দেখলে কেমন হয়!

যা ভাবা, সঙ্গে সঙ্গে ডায়াল ঘোরাতে শুরু করে অরুণ।

এনগেজড।

কলকাতার টেলিফোন যে এত সহজে পাওয়া যায় না, তা ওর অজানা নেই। ফলে আবার ঘোরাতে শুরু করে।

হ্যাঁ, রিং হচ্ছে এবার। শব্দটা যেন ওর হৃদযন্ত্রে গিয়ে আঘাত করতে থাকে।

—হ্যালো। চমকে উঠল অরুণ, ওপাশ থেকেই উত্তর। হ্যাঁ, নারী কণ্ঠই।

অরুণ তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, আমি সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। গলাটা বোধহয় কিছুটা কেঁপে উঠল [illegible]।

—বলুন। কি বলতে চান? ওপাশ থেকে বেশ [illegible] উত্তর।

—দেখুন, এইমাত্র আমি আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু কোন ঠিকানা দেন নি যে দেখা করব।

—আপনার নাম? আবার সেই দৃঢ় গলা।

অরুণ নাম বলল, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কি করেন আপনি? মানে, আপনার পেশা?

—পেশা! অরুণ সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিল, ওর সঠিক পরিচয়টা দেওয়া এখনি উচিত হবে না। বলল, আজ্ঞে পেশা যদি বলেন তাহলে সে রকম কিছুই না। তবে আমার একটা ছোটখাট পার্সোন্যাল ল্যাবরেটরি আছে, একটা লাইব্রেরিও।

—ল্যাবরেটরি! কি হয় সেখানে?

—আজ্ঞে, এই সামান্য কিছু গবেষণা। ফসিলাইজড বডি নিয়ে সামান্য কিছু মাথা ঘামাই। আমার কাছে বেশ কিছু স্পেসিমেনও আছে।

ওপাশ কেমন নিরুত্তর হয়ে গেল।

—হ্যালো শুনছেন? অরুণই আবার কথা বলে।

—হুঁ! গবেষণা করেন। নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থও ব্যয় করতে হয়। অরুণ উৎসাহ পেয়ে বলল, তা কিছুটা হয় বৈকি! ও জন্য ভাবি না।

—বটে, বিয়ে করেন নি নিশ্চয়ই?

অরুণ কেমন ঘাবড়ে গেল, সত্যি কথাটাই বলল, না, এখনো করি নি।

—বয়স কত?

আসল বয়সটাই বলল অরুণ, আজ্ঞে, তেত্রিশ!

—তেত্রিশ! ওপাশ থেকে ক্ষীণ তাচ্ছিল্যের শব্দ, কচি বয়স তাহলে!

—[illegible]টা খুব কম বয়স নয় সুভদ্রাদেবী। সে যাক, আমি কিন্তু আপ[illegible]বাসনা পূর্ণ করতে পারি। বিজ্ঞাপনের ভিতর

দিয়ে আপনার সব কিছু জানা সম্ভব হয় নি। সব যদি জানান, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

হঠাৎ এমন পরোপকার করার ইচ্ছে কেন জানতে পারি কি? সুভদ্রাদেবীর গলার স্বর কেমন পালটে গেল।

অরুণ আবার একটু হকচকিয়ে গেল। আজ্ঞে সব কথাই কি ফোনে বলা যায়, একটু দেখা করার সুযোগ পেলে কিন্তু আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারি।

ওপাশ আবার নিরুত্তর।

অরুণ আবার গলা তুলল, হ্যালো শুনছেন?

—হুঁ।

—আপনার ঠিকানাটা যদি জানান, আজই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

—নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাববেন না? একটা মৃতের সঙ্গে দেখা করবেন?

—মৃত। না, না, কি বলছেন আপনি!

—মৃত বৈকি বেঁচে থেকেও আমি মৃত। তবে এখনও আমার ইন্দ্রিয়গুলি সজীব আছে, এই যা ভরসা। কিন্তু যখন সেই ইন্দ্রিয়ের সজীবতা আর থাকবে না, তখনকার জন্য আমি এমন কিছু আশ্রয় চাই, যা—

ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন। অরুণের মনে হল, ভদ্রমহিলা আবেগে আর কথা বলতে পারছেন না। কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। অরুণের ইচ্ছে হল, শুধায়, দেহটার জন্য অত ভাবনা কেন আপনার? মৃত্যুর পর কারোরই তো অমন বাসনা হয় না; কিন্তু না, আগে ঠিকানা দরকার। আগে দেখা করা দরকার। একবার দেখা করতে পারলে সব রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যাবে। চুপ [illegible] অরুণ।

দু-এক মুহূর্ত কাটল। কিন্তু ওপাশও নি[illegible] অরুণই আবার কথা বলে, হ্যালো শুনছেন? সুভ[illegible]

না তো। হয় তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও বেরিয়ে আসতে পারে।

নাহ্, ব্যাপারটা গোপন না করে ব্রতীশকে বলা দরকার। অরুণ ডাকল, রঘু, এই রঘু।

—যাই দাদাবাবু।

—এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছিলি? কটা বাজে খেয়াল আছে, চা খাওয়াবি না?

রঘু ভেতরে ঢুকল, চায়ের জল বসিয়ে রেখেছি বাবু। ভাবলাম, দুটো হিংয়ের কচুড়ি ভেজে দেব।

—হিংয়ের কচুড়ি আর ভাজতে হবে না। চা খাইয়ে একটা কাজ করে দে দেখি!

—কি কাজ দাদাবাবু? রঘু বাঁ-কাঁধটা খানিক ঝাঁকাল। ওই সেই মুদ্রাদোষ।

বহুবার অরুণ ওর এই কাঁধ ঝাঁকানো স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুদ্রাদোষ কাটাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ব্যাটা মরার পরও হয় তো মাঝে মাঝে কাঁধ ঝাঁকাবে।

—ব্রতীশবাবুর বাড়িতে একটা খবর দিয়ে আসবি। বাবু বাড়ি এলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। বিশেষ দরকার। বুঝলি?

রঘু মাথা নাড়ল।

ব্রতীশের খোঁজে অরুণ নিজেই হয় তো বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সারাদিন কোথায় কোথায় যে থাকে ব্রতীশ ভগবানও জানে না। ওদের চাকরির এই ঝামেলা। আগে যখন ও ফরেনসিকে ছিল, তখন এত ঝামেলা ছিল না। এখন সারদিনই প্রায় আউটডোর ডিউটি। ফোনেও যে ওকে পাওয়া যাবে তারও উপায় নেই।

কিন্তু ব্রতীশকেই ওর এ সময় খুব দরকার। সার্কাস গার্ডেনের বাড়িটা সম্পর্কে পুলিসের ঘরে যদি কোন রিপোর্ট থাকে ব্রতীশই তা বার করে দিতে পারবে। চাই কি, তেমন দরকার হলে ও বাড়িতে

ব্রতীশকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে। মনে মনে বেশ ভরসা পায় অরুণ।

রঘু অল্পক্ষণ পরেই চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। কাপটা অরুণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর একবার কাঁধ ঝাঁকায়। একটা কথা শুধোব দাদাবাবু?

—কি কথা রে?

—আপনি তখন ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?

—কেন, শুনেছিস বুঝি? ভয় নেই, জ্যান্ত মানুষের সঙ্গেই কথা বলেছি। অরুণ হাসি হাসি মুখ করে তাকায়।

রঘু খুব সিরিয়াস, সেই যে যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে, তাদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে। ওরা চিঠির উত্তর দিয়েছে। তাই ফোনে কথা বলে নিলাম।

—ওরা কি চাইছে দাদাবাবু? রঘু আগ্রহে আরো কাছে এগিয়ে আসে।

—কি যে চাইছে, সে কি আর এত সহজে বলতে চায়। কাল দেখা করতে বলেছে। তুই ব্রতীশকে খবর দে, তারপর দেখা যাবে কি হয়!

রঘু কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। আপনি যাবেন ওদের কাছে?

—না যাওয়ার কি আছে! দেখা করতে দোষ কি!

—না দাদাবাবু, ভাল হবে না। আমার মন বলছে, ওদের কোন মতলব আছে। আপনাকে দিয়ে কিছু একটা করিয়ে নিতে চায় ওরা।

অরুণ আবার একটু হাসে, মিছিমিছি তুই ভয় পাচ্ছিস রঘু কাল দেখা করে এলেই সব বুঝতে পারব, একটু অপেক্ষা কর না।

কিন্তু দাদাবাবু আমার মনে হচ্ছে, ওরা এরই মধ্যে আপনার পিছনে লোক লাগিয়েছে।

অরুণ কেমন অবাক চোখে তাকায়, কি রকম ?

—কাল বিকেলে একজন লোক এসেছিল দাদাবাবু, আপনার খোঁজ করছিল।

—কাল বিকেলে! কই, আমাকে বলিস নি তো ?

—কাল তো আপনি অনেক রাতে ফিরলেন, বলা হয় নি। একজন বুড়োমতো লোক এসেছিল। শুকনো শুকনো চেহারা, পরনে ছিল ধুতি আর ফতুয়ার মতো একটা জামা। হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ, তাতে কি সব খাতাপত্র !

—আমার খোঁজে এসেছিল ? কি নাম বলেছে ?

—নাম বলে নি দাদাবাবু। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বললে, সাহেব চিনতে পারবে না। নাম জেনে কি হবে ?

—বটে, তা কি জানতে চাইল ?

—জিজ্ঞেস করল, আপনি কি করেন ? এখানে আর কে কে থাকে ? কখন বাড়ি থাকেন, কখন থাকেন না ? এই সব।

—তুই কি বললি ?

— আমি তো প্রথম দিকে কিছুই বুঝতে পারি নি দাদাবাবু, যা জানি তাই বললাম।

—বললি ! অচেনা একটা লোককে বলে দিলি আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আমার ফ্ল্যাটে চাকরি করিস ? ছি ছি।

রঘু কেমন বোকার মতো তাকায়, লোকটাকে কিন্তু তখন সাংঘাতিক বলে মনে হয় নি দাদাবাবু। তাই বলে ফেললাম।

—আমার সম্পর্কে অচেনা কেউ খোঁজ করতে এল, আর অমনি তুই সব বলে দিবি ! কি যে বলব তোকে।

—সতি কথা বলব দাদাবাবু, লোকটাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল ঘটক। হয় তো আপনার বিয়ের ব্যাপারে খোঁজ করতে এসেছে। আপনার জন্য মেয়ের বাপ তো লোক পাঠাতেই পারে।

রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল অরুণের। বুদ্ধু টার ওপর একটু যদি ভরসা রাখা যায়। বলল, তোর যদি খটকই মনে হবে, যখন আমি বাড়ি থাকি, তখন আসতে বললি না কেন?

—বলেছি দাদাবাবু। লোকটা আবার আসবে বলে গেছে।

অরুণ গম্ভীর হয়ে গেল। রঘু বলল, কিন্তু আজ আপনি যখন ফোন করছিলেন তখন হঠাৎ আমার মনে হল, লোকটার হয়তো কোন খারাপ মতলব ছিল। কেউ হয়তো ওকে পাঠিয়েছিল আপনার খোঁজ নিতে।

—চোর পালালে ব্যাটার বুদ্ধি বাড়ে। যা ভাগ সামনে থেকে। বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল অরুণ।

রঘু কাঁচুমুচু মুখ করে বসে রইল। একটা ভুলই করে ফেলেছে ও।

অরুণ আবার নিজেকে সামলে নিল, কি হল, বসে রইলি কেন! যা, খবর দিয়ে আয়। ব্রতীশ বাড়ি থাকলে ওকে ধরে আনবি।

অপরাধীর মতো ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রঘু। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ব্রতীশ এল সন্ধ্যার কিছু পরে। অরুণ আজ সারাটি দিন বইপত্র নিয়ে কাটিয়েছে। মৃতদেহ রক্ষা করার ব্যাপার নিয়ে কোথাও যদি কোন তথ্য পাওয়া যায়। একমাত্র মিশরের পিরামিড নিয়ে কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। তিব্বত বা রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কেও কিছু কিছু রেফারেন্স আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। অরুণ অবাক হল, আমাদের দেশেও কোন কোন ট্রাইব্যাল মানুষের মধ্যে এই প্রথা রয়েছে। কিন্তু উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেতে পারলে হত। সারাদিন আজ খাতায় নোট-টোট টুকেছে অরুণ। পরে দরকার হলে এগুলিকে কাজে লাগানো যাবে।

এই করতে করতে সন্ধ্যা। তারও কিছু পরে এল ব্রতীশ।

—কি ব্যাপার! চারপাশে এত বই-ফই ছড়িয়ে কি করছিস কমরেড?

অরুণ হাসল, আয় আয়। তোকে সেই সকাল থেকে খুঁজছি।

—কি হয়েছে বল? ব্রতীশ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। রঘু মাংস রাঁধছে নাকি রে, চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে কিন্তু।

—খাবি? অরুণ গলা তুলে রঘুকে ডাকল, রঘু মাংস কতদূর? কষা হলে একটু দিয়ে যাস। আর দু'কাপ কফি।

রান্নাঘর থেকে উত্তর এল, যাচ্ছি বাবু।

অরুণ বলল, নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি রে, তাই তোকে ডেকেছিলাম।

—কি অ্যাডভেঞ্চার?

—সে এক ভারি ইন্টারেস্টিং কেস। দিন আটেক আগে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, দেখেছিস? এক ভদ্রমহিলা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তিনি মৃত্যুর পর তাঁর বডিটাকে প্রিজার্ভ করতে চান।

—তাই নাকি? অদ্ভুত তো! ব্রতীশ আগ্রহে তাকায়, তারপর?

অরুণ সেই বিজ্ঞাপনের কাটিংটা তুলে ধরে ব্রতীশের সামনে, এই দেখ।

ব্রতীশ পড়ল। তারপর হাঁ করে অরুণের দিকে তাকাল, কি ব্যাপার?

—ব্যাপারটা অবশ্য এখনো দুর্বোধ্যই রয়েছে। তবে ওই বকস নম্বরে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার রিপ্লাই এসেছে।

—দেখি দেখি, কি লিখেছে?

অরুণ সুভদ্রাদেবীর চিঠিটা এগিয়ে ধরল ব্রতীশের সামনে।

ব্রতীশ রুদ্ধশ্বাসে পড়ল। তারপর?

—তারপর ফোন তুললাম। সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে কথা বললাম। আজই কথা হয়েছে।

দু' ডিস কষা নিয়ে এল রঘু। দু' গ্লাস জল।

অরুণ বলল, কফি কর।

—কি কথা হল? কিছু বোঝা গেল?

অরুণ হাসে, এ সব মিস্ট্রি তুই তো জানিস এত সহজে ধরা যায় না। তবে ফোনে কথা হয়েছে, কাল ওর বাড়িতে বিকেলের দিকে সশরীরে আমি হাজির দেব।

—কোথায় বাড়ি?

অরুণ বলল, পি-১৭ সার্কাস গার্ডেন ইস্ট। বাড়িটার নাম হচ্ছে বার্মিজ ভিলা। ভদ্রমহিলার কথা থেকে যা বুঝলাম, তিনশ' বছরের পুরানো বাড়ি।

—তাই নাকি! সার্কাস গার্ডেন মানে পার্ক সার্কাসের দিকে তো? ওদিকে অবশ্য অনেক রহস্যময় বাড়ি আছে।

—ওই বার্মিজ ভিলা সম্পর্কে কিছু খবর জানবার জন্যই তোকে ডেকেছিলাম।

—লালবাজারে ফোন করলেই তো পারতি? তাছাড়া পার্ক সার্কাস থানা রয়েছে। ও আর আমি তোকে কি শেখাব।

—আমি ব্যাপারটা খুব গোপন রাখতে চাইছি। পুলিশকে জানালেই তো নানা রকম ফেউ জুটে যাবে। তুই প্লিজ একটু খুঁজে পেতে দেখ না, বাড়িটা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট আছে কিনা!

—ঠিক আছে, দেখব।

—দেখব না, কাল পরশুর মধ্যেই খবর চাই। কাল বিকেলে ও বাড়িতে যাব কথা দিয়েছি, তার আগে পেলেই সুবিধা হয়।

—চেষ্টা করব। তবে পুলিশের ব্যাপার তো জানিস।

কফি নিয়ে এল রঘু।

অরুণ এক টুকরো মাংস মুখে পুরে নিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি করতে বলছি কেন জানিস, কাল বিকেলে নাকি কে একজন অচেনা লোক আমার পাত্তা নিতে এসেছিল।

—মানে !

অরুণ রঘুর দিকে তাকায়, এই রঘু বল না। কাল সেই লোকটা কি কি জানতে চাইছিল তোর কাছে ?

রঘু দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন যেন সন্দেহ সন্দেহ চোখ দাদাবাবু। এসে জানতে চাইল, দাদাবাবু কি করেন ? কখন বাড়ি থাকেন ? কখন বেরিয়ে যান ? আর কে কে থাকে বাড়িতে—এইসব।

—দেখতে কেমন ?

রঘু বলল, শুকনো শুকনো চেহারা, পরনে ছিল ধুতি আর ফতুয়ার মতো একটা জামা। হাতে কাপড়ের ব্যাগে কিছু কাগজপত্র ছিল বাবু।

—হু ব্রতীশ গম্ভীর মুখে তাকাল, লোকটা যে ওই বার্মিজ ভিলার সঙ্গে জড়ান, তা মনে হল কেন ?

রঘু বলল, লোকটাকে আমি ঘটক ভেবে ভুল করেছিলাম। ভেবে ছিলাম—

—তুই থাম। ধমকে উঠল অরুণ। আসলে কি জানিস, লোকটার কোন খারাপ মতলব নাও থাকতে পারে। কিন্তু সচরাচর এরকম তো কেউ আসে না, তাই সন্দেহ হচ্ছে।

ব্রতীশ বলল, ঠিক আছে, চল, এখন তো কোন কাজ নেই, একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় ?

—চল না, বার্মিজ ভিলাটা কোথায় একটু দেখে আসি।

অরুণ বলল, দু'জনে মিলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে। তাছাড়া আমি কাল বিকালে যাব বলেছি।

—ধুর বোকা ! বাড়িতে কে এখন ঢুকতে যাচ্ছে। চল না, বাড়ির সামনে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আসি। বাড়ির আশেপাশে নির্ঘাৎ কোন চা সিগারেটের দোকান পাওয়া যাবে। তোকে আর কি বোঝাব, চল্।

অরুণ বুঝল, বাড়িটাকে বাইরে থেকে খানিকটা ওয়াচ করতে চায় ব্রতীশ। বলল, চল, ঠিক আছে।

পাক সার্কাসে বড় রাস্তার মোড়েই ট্যাকসি থেকে নেমে পড়ে ওরা। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। অর্থাৎ রাত এমন কিছু বেশি নয়। ওরা সিগারেট ধরিয়ে গল্প করতে করতে এগোতে থাকে। রাস্তা তখনো বেশ জমজমাট। যথেষ্ট লোকজন চলাফেরা করছে। কলকাতায় রাত আটটা একটা রাতই নয়।

ওরা বড় রাস্তা ছেড়ে এ-গলি সে-গলি ধরে অনেকক্ষণ হাঁটল। অবশেষে বার্মিজ ভিলার কাছাকাছি এগিয়ে এল।

বিশাল বাগানঅলা বাড়ি। চারপাশে নানারকম বড় বড় গাছের সারি। অত গাছ বলেই বাড়িটা কেমন আলো-ছায়ায় ঢাকা। কেমন একটা থমথমে পরিবেশ।

অরুণ বলল, বাড়ি না প্রাসাদ রে, এ যে বিরাট ব্যাপার!

ব্রতীশ উত্তর দিল না। দূরে বাড়ির গেটটা দেখা যাচ্ছে। গেটের কাছে ছোট্ট একটা খুপড়ি, হয়তো দারোয়ান টারোয়ান থাকে। বাড়ির পুরো চেহারাটা দেখতে হলে গেটের দিকে যাওয়া দরকার। এদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

কিন্তু গেটের দিকে এগিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারাটা কি ঠিক হবে! ব্রতীশ বলল, ওপাশে কয়েকটা দোকান দেখা যাচ্ছে, ওদিকে চল। চায়ের দোকান থাকলে চা খেয়ে নেওয়া যাবে।

অরুণ রাজি, চল।

ওরা চায়ের দোকানের সামনে এসে এক পলক আবার বাড়িটাকে দেখে নিল, তারপর দোকানে ঢুকে পড়ল।

চায়ের পাট প্রায় গুটিয়ে ফেলার সময় হয়ে এসেছিল দোকানীর। ব্রতীশ অনুরোধ করল, দু' কাপ চা পেলে কিন্তু খুব উপকার হত দাদা।

দোকানদার বেশ বয়স্ক লোক। ক্যাশ গুনছিল বসে বসে, বলল, বসুন।

—এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিচ্ছেন? প্রশ্ন করে অরুণ।

দোকানদার হাসল, এটা বুঝি তাড়াতাড়ি হল, কোথায় থাকেন আপনারা?

ব্রতীশ বলল, একটা কাজে এসেছিলাম। এত দেরি হয়ে যাবে বুঝি নি। বলতে বলতে পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করল, চলে?

দোকানী অদ্ভুতভাবে তাকাল ব্রতীশের দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নিল।

সিগারেট ধরাল অরুণও।

ব্রতীশ বলল, আসলে একটা খবরের জন্য এসেছিলাম, কিন্তু ভুল নম্বরের জন্য বাড়িটা খুঁজে পেতেই রাত হয়ে গেল।

—কোন বাড়ি বলুন তো?

অরুণ কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল, ব্রতীশ শুরু করল কি! ও কি বার্মিজ ভিলার কথাও শুরু করবে নাকি! ব্রতীশকে ও চোখ ইশারায় থামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই ব্রতীশ বলল, ওই বার্মিজ ভিলা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে পারেন?

—বার্মিজ ভিলা। ও তো মশাই একটা ভূতুড়ে বাড়ি! কেন, কি হয়েছে ওখানে?

দু'কাপ চা রেখে গেল ছেলেটি। ওপাশে কয়েকটি ছোকরা তখনো চেয়ার জুড়ে বসে গল্প করছে। গল্প করার ফাঁকে কান পেতে শুনছে না তো! অরুণের কেমন অস্বস্তি লাগে।

ব্রতীশ বলল, আসলে কি জানেন, জমি বিক্রি আছে বলে খবর পেয়ে এসেছিলাম। আমাদের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন ভদ্রলোক, এসে দেখি সেখানে এই বার্মিজ ভিলা।

—কত নম্বর?

ব্রতীশ বলল, পি ১৭, সার্কাস গার্ডেন ইস্ট।

দোকানদার বলল, হ্যাঁ, বার্মিজ ভিলারই ওই নম্বর। কিন্তু ওখানে জমি বিক্রি হবে কে বললে! ও-বাড়ির চারপাশে অবশ্য জমির অভাব নেই, কিন্তু ও-সব জমি বিক্রি হবে বলে তো কানে আসে নি।

—কি জানি দাদা, আমরা হয়তো ভুল খবরই পেয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িটা বড় অদ্ভুত তো। এত বড় বাড়ি, লোকজন আছে বলে কিন্তু মনেই হয় না।

দোকানদার উৎসাহ নিয়ে বলল, ও বাড়িতে যে-কটি মানুষ তার দশ গুণ হচ্ছে কুকুর। কুকুরদের জন্য প্রত্যেক দিন ওরা কত মাংস কেনে জানেন?

ব্রতীশ আর অরুণ তাকিয়ে থাকে।

—প্রতিদিন কম করে দশ কেজি। কসাইয়ের সঙ্গে সারা বছরের মাংস সাপ্লাই-এর চুক্তি করা থাকে।

অরুণ বলল, এত কুকুর কেন?

—খেয়াল মশাই, বড়লোকের খেয়াল।

ব্রতীশ শুধায়, কে কে থাকেন ও বাড়িতে?

দোকানদার আবার উৎসাহ পেয়ে বলে, তা ওখানে ছোটয় বড়য় সব মিলিয়ে তিরিশ-চল্লিশটা ঘর আছে শুনেছি, কিন্তু থাকবার মতো বলতে একজনই। আর তার দেখাশোনা করার জন্য কয়েকজন। ও-বাড়ির নায়েব তারাপদবাবু তো মাঝে মাঝে আমার দোকানে এসে চা-ও খেয়ে যান।

—তারাপদবাবু! কি রকম দেখতে বলুন তো? প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

—কাল সকালে আসুন-না, আলাপ করিয়ে দেব, জমি বিক্রি আছে কি নেই সব জেনে যেতে পারবেন।

ব্রতীশ সামান্য একটু হাসে, দেখি, চেষ্টা করব। তবে ভূতুড়ে

বাড়ি না কি বললেন ওখানে জমি-টমি কেনা কি উচিত হবে! দেখি, ভেবে দেখি!

অরুণ শুধায়, অতগুলো ঘর বাড়িতে, কি হয় ওখানে?

—কি আবার হবে। বছরের পর বছর ও-গুলো তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। লোক থাকলে তো ব্যবহার করবে।

—ভাড়া দেয় না?

—দেবে না কেন, দিয়েছে। ভূতেরা ওখানে বাস করে। ভদ্রলোক মজা করে হেসে উঠল।

—ভূতেরা!

—আরে হ্যাঁ মশাই, পাড়ার সবাই জানে ও বাড়িতে মাঝে মাঝে গভীর রাতে নানান সব কাণ্ড হয়।

—কি হয়? আগ্রহে তাকায় ওরা।

লোকটা বলল, আমরা বাইরে থেকে তো সব বুঝতে পারি না, তবে মাঝে মাঝে কোন কোন ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। যে সব ঘর বহুকাল ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেখানেও আলো জ্বলে ওঠে। আলো জ্বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকে। কারণ না থাকলে ও-সব হবে কেন বলুন।

—তারাপদবাবু কিছু বলেন না?

—কি আর বলবেন! ও-বাড়ির সব লোকই কেমন ছন্নছাড়া। পুরো একটা পাগলের বাড়ি মশাই! সবার মাথাতেই ছিট আছে। আমরা জিজ্ঞেস করলে কেবল হাসে।

ব্রতীশ বলল, তবু ভাল, বাড়িটা সম্পর্কে কিছু জানতে পারলাম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। চায়ের দাম মিটিয়ে দিল অরুণ।

ঘড়িতে ন'টা দশ। চায়ের দোকানটা ততক্ষণে একেবারে প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। ওরা উঠে পড়ল।

বাইরে বেরিয়ে একটা সিগারেটের দোকান। পকেটে সিগারেট থাকতেও একটু দাঁড়াবার জন্য সিগারেট কিনল। সিগারেট ধরাল।

ব্রতীশ বলল, আয় একটু হেঁটে নিই। বাড়িটাকে একটা চক্কর দিয়ে নিই চল।

অরুণ আপত্তি করল না, চল।

ওরা আবার হাঁটতে থাকে। বাড়িটার চারপাশে জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল। পেছনের দিকে একটা বস্তিমতো। আরো কিছু দোকানপাট ওদিকে। বস্তিটা বেশ সজাগ বলে মনে হল ওদের। অনেকেই ওদের দিকে তাকাচ্ছে। অরুণ শুধায়, বস্তির ভিতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছি রে? বাড়িটার ওদিকে বোধ হয় রাস্তা নেই।

ব্রতীশও একটু দাঁড়ায়। বস্তিটা এমনভাবে বার্মিজ ভিলার সঙ্গে লেগে আছে যে, সত্যি সত্যি পথ চেনা দায়। এই বস্তির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছব কে জানে। তবু ব্রতীশ বলল, চল না, এগোই আর একটু।

আবার এগোতে থাকে ব্রতীশরা।

বস্তির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা দু'মুখো রাস্তা। ডান দিকের রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকটায় খানিকটা এগোয় ওরা। একটা বিরাট বড় ঝিলমতো চোখে পড়ল ওদের। তারপরই রাস্তা শেষ।

অরুণ বলল, মনে হচ্ছে, বার্মিজ ভিলার একেবারে পেছন দিকে চলে এসেছি।

বিশাল বাড়িটা এখান থেকে বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ওরা দেখল, বাড়ি তো নয়, সত্যিকার যেন একটা দুর্গ। দেয়াল ফুঁড়ে ফুঁড়ে বেশ কিছু গাছপালাও গজিয়েছে দেখল ওরা। কিন্তু এদিক থেকে পুরো বাড়িটা কেমন অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। একটাও জানালা খোলা নেই। কোন ঘরে যদি আলো জ্বলে তাও বোঝার উপায় নেই।

—আপনারা কাকে চাইছেন?

হঠাৎ চমকে উঠেছিল ওরা। দেখল, লুঙ্গি পরা খালি গা একটা লোক।

ব্রতীশ বলল, আমরা বোধহয় পথ ভুল করেছি। ঝিলের ওপারে যাওয়ার রাস্তা নেই?

- ঝিলের ওপারে? ওখানে কি করবেন?

—না মানে, আমরা পার্ক সার্কাসের বড় রাস্তার দিকে যাব। বার্মিজ ভিলার কাছে একটু কাজ ছিল, এসেছিলাম।

লোকটা ভাল করে লক্ষ্য করল ওদের। বলল, এই দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যান। ঝিলের ওদিকে এগোলে বড় রাস্তা পাবেন। সাবধানে যাবেন।

—সাবধানে কেন?

– কেন কি, দেখছেন না, কি অন্ধকার! উলটি খেলে একেবারে ঝিলেব মধ্যে গিযে পড়বেন। তাছাড়া এ রাস্তায় না এলেই ভাল করতেন। সাপটাপেরও ভয় আছে এদিকে.

অরুণ কেমন শিউরে উঠল, তাহলে আর কোন রাস্তা নেই?

ব্রতীশ শক্ত করে হাত চেপে ধরে অরুণের, আরে, এটুকু তো পথ, চল না পেরিয়ে যাই।

একে অন্ধকার। তায় বেশ জংলা ঘাসও। সাপ লুকিয়ে থাকা সত্যি সত্যি অস্বাভাবিক নয়। অরুণ কেমন হতাশ চোখে তাকাল, ব্রতীশ আর একটা সিগারেট ধরাল। বলল, দেওয়ালের গা ধরে ধরে আয়। অত ভয় পেলে এ-সব কাজ করবি কি করে?

অরুণ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, সেই লোকটা তখনও অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, লোকটা নির্ঘাৎ আমাদের সন্দেহ করেছে।

ব্রতীশ বলল, করতেই পারে। রাত দশটার সময় এভাবে হঠাৎ দুটো লোককে দেখলে আমাদেরও সন্দেহ হত। আয়, তাকাস না পেছনে, চল।

ঝিলের গা ধরে এগোতে এগোতে এক সময় ভীষণ পচা দুর্গন্ধ নাকে লাগল। কিছু হয়তো মরে পড়ে আছে। কি হতে পারে কে

জানে। নাকে রুমাল চেপে আরো খানিকটা এগিয়ে দেওয়ালের গায় বিরাট একটা ফাটল চোখে পড়ল ওদের। ব্রতীশ থমকে দাঁড়াল, এই অরুণ, দেওয়ালের দিকে 'তাকা।

ব্রতীশ না বললেও ফাটলটা অরুণের চোখে পড়েছিল। অনায়াসেই ওই ফাটলের ভিতর দিয়ে বার্মিজ ভিলার কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়া যায়। ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, তারপরই বাড়ির শুরু। বাড়ির পেছন দিক বলেই বোধহয় অন্ধকারটা একটু বেশি। তাছাড়া জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। কলকাতায় এমন নির্জন জায়গা আছে, ভাবাই যায় না।

—ঢুকবি? প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

অরুণ বাধা দিল, না। চোরের মতো ঢুকে লাভ নেই, কাল তো এমনিতেই ও বাড়িতে যাব। তাছাড়া, সেই চায়ের দোকানে কি বলল শুনিস নি? যত মানুষ ও বাড়িতে, তার দশগুণ কুকুর। মিছি-মিছি বিপদে পড়ব।

—ঠিক আছে, চল তাহলে ফিরি এবার। ফাটলটার কথা কিন্তু মনে রাখিস। বাড়ির পেছন দিকে যদি আসিস, তাহলে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার এটাও একটা রাস্তা।

—মনে হয় না তেমন কিছু প্রয়োজন হবে। অরুণ কিছুটা ধরা গলাতেই উত্তর দিল।

ওরা দেয়াল ধরে ধরে আরো এগিয়ে এল! ঝিলের শান্ত জলের ওপর ওদিককার রাস্তার আলো এসে গড়িয়ে পড়েছে। ওরা দেখল, সামনেই বড় রাস্তা। তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে উঠল ওরা। তারপর নিঃশব্দে বাড়ি মুখে রওনা দিল।

অরুণ যখন বাড়ি এসে পৌঁছল তখন অনেক রাত। অত রাতে আর বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করল না ওর।

পরদিন সকালে যথাবিহিত ঘুম থেকে উঠেই ব্রতীশের ফোন পেল অরুণ, কি রে আজ যাচ্ছিস তো ?

ব্রতীশের গলায় যথেষ্ট উৎসাহ। অরুণ বলল, যাবো তো বটেই। দেখে আসতে দোষ কি! রাতে ফিরে এসে যদি সময় পাই তোর সঙ্গে দেখা করব।

ব্রতীশ বলল, একটা কথা মনে রাখিস, তোর ওই সুভদ্রাদেবী না কি নাম তার সঙ্গে যা কথা হয় হবে, কিন্তু তারাপদবাবুটাকে মাথায় রাখিস। ওর কাছ থেকেই আসল রহস্য বার করতে হবে।

অরুণ বলল, ঠিক আছে।

—আর, চায়ের সেই দোকানটা অ্যাভয়েড করিস।

অরুণ ছোট্ট করে উত্তর দিল, হুঁ।

—আর একটা কথা, তুই কি ক্যামেরা নিয়ে যাবি ? প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

—সেটা কি ঠিক হবে ? প্রথম দিনটা বরং এমনিই ঘুরে আসি। পরে ভেবে দেখা যাবে।

—ঠিক আছে, তাই যা তা হলে। রাতে কিন্তু তোর জন্য অপেক্ষা করব।

অরুণও বলল, ঠিক আছে, তারপর ফোন ছেড়ে দিল।

এরপর সারাটি দিন কেমন একটা উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল অরুণের। দু'একবার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। সুভদ্রদেবীটিকে যতক্ষণ না চোখে দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ যেন কিছুই হবার নয়। রঘু মাঝে মাঝে উপদেশ দেবার চেষ্টা করছিল, দাদাবাবু ও-সব মড়াফড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করলে কি চলত না ?

তুই আগে তোর মুদ্রাদোষটা ছাড় দেখি। তুই যে অত কাঁধ ঝাঁকাস ব্যথা হয়ে যায় না ? পাল্টা প্রশ্ন করেছিল অরুণ।

রঘু বোকার মতো হাসে। মুদ্রাদোষটা নিয়ে ওকে কম কথা শুনতে হয় না, কিন্তু ও কি আর ইচ্ছে করে কাঁধ ঝাঁকায়।

—যা, চা করগে। দাদাবাবুর জন্য আর তোকে মাথা ঘামাতে হবে না, যা ভাগ। রঘু উঠে গেল।

বিকেল চারটা নাগাদ অরুণ তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্যাকসি নিয়ে সটান বার্মিজ ভিলার সদর গেটে। একপলকে দেখল, হাত পঞ্চাশেক দূরে রাস্তার ওপারে সেই চায়ের দোকানটা। দোকানে ছেলে-ছোকরাদের বেশ একটা আড্ডা বসেছে।

অরুণ এরপর দোকানের দিকে খুব একটা তাকাল না। কালকের সেই দোকানদারটা দেখতে পেলেই হয়তো ওকে চিনে ফেলবে। ও-সব ঝুট-ঝামেলায় ঢোকার এখন সময় সেই ওর।

ট্যাকসির ভাড়া মিটিয়ে দেয় অরুণ। তারপর ভিলার গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিশাল গেট। কিন্তু টিনের দরজাটা বন্ধ। একপাশে মাথা নিচু করে ঢোকার মতো আর একটা কাটা দরজা। ওখান দিয়েই ঢোকা যায়।

অরুণ কি করবে একবার ভাবল। কাটা দরজার সামনে এসে একবার উঁকি দিল ভিতরে। ধারেকাছে কাউকেই দেখা গেল না। গেট থেকে মূল বাড়িটা প্রায় শ'খানেক হাত দূরে। মোরাম বিছানো চওড়া একটা রাস্তা বাড়ির সদরে গিয়ে লেগেছে। রাস্তার দু'পাশে ফুলের কেয়ারি, কিছু কিছু পাথরের স্ট্যাচু। পুরনো আমলের বাড়িতে ও ধরনের স্ট্যাচু থাকাটাই স্বাভাবিক।

অরুণ কাটা দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়ল। বাইরে দাঁড়িয়ে এভাবে ভেতরে উঁকি মারাটা ভাল হচ্ছিল না। রাস্তার লোকজন দেখলে ওকে সন্দেহ করত।

ভিতরে ঢুকে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে অরুণ। অন্তত রাস্তার দশজনের হাত থেকে তো সরে আসতে পেরেছে।

—এই যে, কাকে চাই ?

হঠাৎ চমকে উঠল অরুণ, কাটা দরজার ফাঁক গলিয়ে আর একজন লোক ঠিক ওরই পেছন পেছন ঢুকেছে। পরনে ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়ার মতো জামা, পায়ে নোংরা একটা চপ্পল।

অরুণ বলল, আমি একটু সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি ?

লোকটা নিজের পরিচয় না দিয়েই আপাদমস্তক দেখে নিল অরুণের। কাল তাহলে আপনার সঙ্গেই রাণীমার কথা হয়েছিল ফোনে! আসুন. আমার সঙ্গে আসুন।

লোকটা কেমন রোগামতো। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। চায়ের দোকানে গতকাল যে তারাপদবাবুর কথা শোনা গিয়েছিল, এই কি সেই! অরুণ লোকটাকে অনুসরণ করে.

হাত পঞ্চাশেক দূরে বিরাট বাড়িটার সিঁড়ি, থাকে থাকে প্রায় একতলা অবধি উঠে গেছে। অনেকটা সেই পুরোনো সিনেট হাউসের সিঁড়ির মতো সামনের দিকে বিশাল বড় বড় কয়েকটা থাম। মাথায় দোচালার মতো ছাদ। প্রাচীন ইতিহাস আর ঐতিহ্য যেন ধরে রেখেছে বাড়িটা।

অরুণ দেখল. বাড়ির ওপরের দিকে প্রচুর পায়রা, ঘুর ঘুর করছে। আরো একটু ওপরে দেয়াল ফুঁড়ে কিছু কিছু গাছ গজিয়ে উঠেছে। বাড়িটার বয়স যে তিনশ' বছরের কম নয়, এখন আর অবিশ্বাস করার উপায় নেই।

হঠাৎ আবার চমকে ওঠে অরুণ। গোটা কয়েক কুকুর এক সঙ্গে বিকট চিৎকার করে ডেকে উঠেছে। একটু থমকে দাঁড়াল ও। কাল সেই চায়ের দোকানের কথা মনে পড়ল ওর এ বাড়িতে নাকি মানুষ যত তার চেয়ে কুকুরের সংখ্যা বেশি।

লোকটা এবার অরুণের দিকে তাকাল, ভয় নেই আমার সঙ্গে আসুন। কিন্তু কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠতেই আবার অরুণ দাঁড়িয়ে

পড়ল। বিশাল আকারের একটা কুকুর এসে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। অরুণের সারা গা হিম হয়ে এল নিমেষের মধ্যে।

লোকটাই অরুণকে বাঁচাল। কুকুরটার নাম ধরে ডেকে উঠল, পপি! গলার স্বরে বেশ আদেশের ভঙ্গি।

পপি লেজ নাড়তে থাকে। খুশিতে না অন্য কিছুতে কে জানে।

—সরে যাও, বলছি! সরো। আদেশ করে লোকটা।

পপি তবু একবার অরুণের গায়ে ঝুঁকে গন্ধ শুঁকে শেষপর্যন্ত পথ ছাড়ে।

—আসুন। ভয় নেই, কিছু করবে না ওরা।

অরুণ আড়ষ্টভাবে বিশাল বারান্দায় উঠে এল। আর এ সময় ছুটে এল আরো কয়েকটা কুকুর। আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

আবার ধমকে উঠল লোকটা। কি হচ্ছে? সরো, সরো বলছি।

কুকুরগুলি যেন লোকটার কথা বুঝতে পারে। তেমন কিছু দূরত্বে সরে না গেলেও অরুণকে ঘরে ঢোকার পথ ছেড়ে দেয়।

এরপর বিশাল মেহগিনি কাঠের কাজ করা দরজার ভিতর দিয়ে অরুণকে নিয়ে লোকটা ভেতরে ঢুকে পড়ল। কারুকাজ করা ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছে উপরে। অরুণ এক পলকে দেখল, ঘর জোড়া কার্পেট বিছানো, একপাশে বহু পুরনো আমলের সোফা চেয়ার। বিরাট একটা দেয়াল ঘড়ি। ঘড়ির শব্দ হচ্ছে টিকটিক করে। দেখল, আর এক দিককার দেয়ালে পর পর বেশ কয়েকটা অয়েল পেন্টিং। হয়তো এই পরিবারেরই পূর্ব পুরুষদের ছবি।

কিন্তু ঘরের খুঁটিনাটি ভাল করে দেখে নেবার অবসর ছিল না তখন। কুকুরগুলি যেভাবে ওকে ঘিরে রেখেছে তাতে প্রাণ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকা।

লোকটা বলল, এখানে এই সোফায় বসুন, আমি রাণীমাকে খবর দিই। কি নাম যেন আপনার?

অরুণ নাম বলল। বলে সোফায় আড়ষ্ট হয়ে বসল। ওদিকে

কুকুরগুলি ওর ওপর যেন হামলে পড়তে চায়। অরুণ পা গুটিয়ে আবার অসহায়ভাবে তাকাল।

—এই যে দাদা, এগুলোকে একটু সরানো যায় না!

লোকটা নির্বিকার। ভয় নেই, কিচ্ছু করবে না। আমি এখনই খবর দিয়ে আসছি।

অরুণকে একা বসিয়ে রেখে লোকটা সামনের বিশাল দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

এমন সময় সোফার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল একটা কুকুর। অরুণ আবার ভয়ে পিঠটাকে পিছনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল। বোকার মতো একটু হাসল। যেন কুকুরদের বোঝাতে চাইল, ও কোন ক্ষতি করতে আসে নি এ বাড়ির। বরং উপকার করতেই এসেছে।

হঠাৎ দেয়ালঘড়িটা সুরেলা শব্দ তুলে সারা ঘরটাকে কাঁপিয়ে তুলল, অরুণ শব্দগুলো গুনতে লাগল। ছটা। তার মানে সন্ধ্যা হয়ে গেল বলতে হয়। অথচ এই ঘরের থমথমে পরিবেশের মধ্যে বসে মনে হচ্ছে যেন গভীর রাত।

আহ্, বড্ড জ্বালাচ্ছে তো কুকুরগুলো! গা চাটবার জন্য যেন এগিয়ে আসছে এক একটা। অরুণ খুব বেশি বাধা দিতেও পারছে না। কুকুরগুলোর মর্জি বোঝা ভার।

কতক্ষণ যে ওইভাবে কাটল, কে জানে। অবশেষে সেই লোকটা আবার পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, আসুন। ভেতরে আসুন।

অরুণ উঠল। কুকুরগুলোও সঙ্গ ছাড়ার নয়। ঘামতে ঘামতে পর্দার সামনে এসে দাঁড়ায় অরুণ।

লোকটা বলল, যান, ভেতরে রাণীমা অপেক্ষা করছেন।

অরুণ অসহায়ভাবে শুধাল, আপনি?

—আমি এখানেই আছি। আপনি রাণীমার সঙ্গে কথা বলবেন তো, যান।

আর অপেক্ষা করা সাজে না, পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে অরুণ।

ঢুকে মনে হল, এ আর এক আশ্চর্য ঘর। আকারে এ ঘরটাও বেশ বড়। সারা ঘরে পুরু কার্পেট। ওপরে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলছে। ঝাড় লণ্ঠনের রহস্যময় আলো যেন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছে।

কিন্তু ঘরের ভেতর কাউকেই দেখতে পেল না অরুণ। সামনের দেওয়ালের দিকে হালকা মশারী টানানো একটা খাট। সেই মান্ধাতার আমলের পুরোন কারুকাজ করা ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো দেখাচ্ছে খাটটাকে। মশারীর ভিতর দিয়ে খাটের দুগ্ধ-সফেন বিছানাটাকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু না, কেউ নেই বিছানায়।

ঘরের একপাশে এখানেও সোফা সেট, সেণ্টার টেবিল। ওদিকে উঁচু টুলের ওপর শ্বেত পাথরের একটা নারী মূর্তি। মূর্তিটা যে কার কে জানে!

কুকুরগুলি লাফিয়ে খাটের কাছে এগিয়ে গেল, আবার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফিরে এসে ঘিরে ধরল ওকে।

অরুণ কি যে করবে, ঠিক বুঝতে পারল না। দু' পাশের দেয়ালে দুটো দরজা। ভারি পর্দা ঝুলছে। এখন কি উচিত কোন একটা পর্দা সরিয়ে আরো ভেতরে ঢুকে যাওয়া। কিন্তু না, সেটা ঠিক হবে না ওর। বরং সামনের ঘরটাতেই আবার ফিরে যাওয়া যাক, সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে।

অরুণ আবার বেরিয়ে আসার জন্য ঝুঁকতেই শুনতে পেল, কে যেন বলছে, সামনের ওই সোফায় গিয়ে বসুন।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। এ তো সেই কালকেরই গলা। সুভদ্রাদেবীরই গলা। ফোনে এ গলার আওয়াজই কাল ও শুনেছে।

অরুণ সোফার দিকে একটু একটু করে এগোল। ভয়ে ভয়ে বসে পড়ল।

আর এ সময় পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল একটা সাইকেল চেয়ার। চট করে উঠে দাঁড়াল অরুণ। চেয়ারে এক শীর্ণদেহী মহিলা। চেয়ারের পেছনে আর একজন মহিলা ধীরে ধীরে চেয়ারটি টেনে ঘরের মাঝখানে নিয়ে আসছে।

তবে কি এই সেই সুভদ্রাদেবী। অরুণ হাত জোড় করে নমস্কার জানাল।

ভদ্রমহিলাও হাত জোড় করে প্রতি নমস্কার জানালেন। বসুন। তারপর পিছনের মহিলাকে ইশারা করলেন ঘর থেকে সরে যেতে।

কুকুরগুলি ভদ্রমহিলার কোলে-কাঁখে লাফিয়ে উঠে অসম্ভব রকম আদিখ্যেতা শুরু করে দিল। যাক বাবা, অরুণের কাছ থেকে যে ও-গুলি সরে গেছে এই যথেষ্ট।

ভদ্রমহিলা আবার অরুণের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলেন, দিনরাত এদের নিয়েই আজকাল আমার সময় কাটে। পৃথিবীতে এদের মতো বিশ্বস্ত জীব আর কেউ নেই।

অরুণ তাকিয়ে থাকে। এ'কথার কোন উত্তর হয় না। তবে ভদ্রমহিলার গলার স্বরে মানুষ সম্পর্কে কেমন এক বিতৃষ্ণার ঝাঁজ। অরুণ দেখল, ভদ্রমহিলার পরনে সাদা জমিন হালকা সবুজ পাড়-অলা একটা শাড়ি। গায়ে ফুলকলি জামা, আজকালকার মেয়েদের সাধারণত এ ধরনের জামা পরতে দেখা যায় না। পায়ে সরু স্ট্র্যাপের কাজ করা চপ্পল। চোখে হালকা রূপোলি ফ্রেমের চশমা।

কুকুরগুলিকে ধমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। যা, ওদিকে গিয়ে বোস। যাহ্।

আশ্চর্য, কুকুরগুলি একপাশে সরে গেল। কার্পেটের ওপর গায় গায় সেঁটে বসে পড়ল। কেমন বিনীত শান্ত ভঙ্গি।

—আপনি একা থাকেন এখানে? হঠাৎই প্রশ্ন করে অরুণ।

—একা! ভদ্রমহিলা যেন একটু চমকে উঠলেন, পরে বললেন,

না না, একা কেন, এই তো এরা আছে। এদের সঙ্গেই সময় কেটে যায়। তা যাক, কাজের কথায় আসা যাক।

ভদ্রমহিলা তাঁর সাইকেল চেয়ারের চাকা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে এলেন অরুণের দিকে। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, আসলে আমি এমন কোন লোকের ওপর নির্ভর করতে চাইছি যার পিছুটান বলতে কিছুই থাকবে না। আপনার যা বয়স, তাতে—

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে কথা টেনে নেয়, আমি কিন্তু পিছুটান না রেখেই এসেছি। আসলে মৃত্যু ব্যাপারটা আমাকে ভীষণভাবে ভাবায়, তাই আপনার বিজ্ঞাপন দেখে আমি চুপ করে থাকতে পারি নি।

—মৃত্যুর পরেও যে দেহটার প্রয়োজন আছে আপনি তা বিশ্বাস করেন ?

অরুণ আগ্রহ নিয়ে বলল, নিশ্চয়ই করি। কেউ যদি না করে সেটা তার অজ্ঞতা।

ভদ্রমহিলা খানিকটা নিরব থাকলেন, আমি কিন্তু করি না। কোনদিন ও কথা বিশ্বাস করি নি।

চমকে উঠল অরুণ। ভদ্রমহিলা কি ওকে বাজিয়ে নিতে চাইছেন। চাইবেন যে সন্দেহ নেই। কিন্তু উনি যদি বিশ্বাসই না করবেন তাহলে মৃত্যুর পর নিজের দেহটাকে অটুট রাখার জন্য এত বাসনাই বা জানিয়েছিলেন কেন বিজ্ঞাপনে !

– না, আমি একদম বিশ্বাস করি না। ভদ্রমহিলা আবার নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন, আসলে ও-সব প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে।

অরুণের বোধহয় চট করে হার মেনে নেওয়া উচিত হবে না। অরুণ বলল, পৃথিবীর বহু জায়গাতেই মৃত্যুর পর দেহ রক্ষা করার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হাজার হাজার বছর ধরে মৃতদেহ রক্ষা করে চলেছে কেউ কেউ।

—হ্যাঁ, তা করছে, মানুষের কত রকম বিশ্বাস। বিশ্বাসটা ভেঙ্গে গেলেই আর করত না।

—তার মানে, আত্মা বিশ্বাস করেন না আপনি? মৃত্যুর পর যে আত্মা দেহের মধ্যে আবার ফিরে এসে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে তা ঠিক নয় বলছেন?

—আত্মার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারি না। ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কুকুরগুলি আবার কখন ওঁর গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল উনি খেয়াল করেন নি। অরুণ দেখল, ভদ্রমহিলার রূপোলি ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে চোখের মণিদুটো টলটল করছে। কেমন গোলোকধাঁধায় পড়ে গেল অরুণ। ভদ্রমহিলা যদি এ-সব বিশ্বাসই না করেন তাহলে দেহটা রক্ষা করার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কেন!

—আসলে কি জানেন, ও-গুলো হচ্ছে বিকৃতি।

—বিকৃতি! কি রকম?

ভদ্রমহিলা বললেন, যাকে ভালবাসা যায়, যাকে না দেখলে বুকে অসম্ভব যন্ত্রণা হয়, তাকে রক্ষা করার চেষ্টা চলবেই।

—কি রকম? অরুণ পড়ুয়া ছাত্রের মতো প্রশ্ন করে।

—কি রকম! আচ্ছা এককালে রেড ইণ্ডিয়ানরা মৃতদেহ রক্ষা করত জানেন?

অরুণ রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে রেফারেন্স এর আগে সামান্যই পেয়েছে। তাকিয়ে রইল।

—মিশরীয়রা যেভাবে 'মমি' তৈরি করত ওরা ঠিক সেভাবে করত না। মিশরের কিংবা সুমেরু দেশের লোকেরা মৃতদেহ থেকে মস্তিষ্ক বা অন্যান্য আরো কিছু বাদ দিয়ে সেখানে রজন, ধূপ, বিটুমেন বা অন্য সব সুগন্ধী টুগন্ধী ভরে বাইরে থেকে চামড়া সেলাই করে রক্ষা করত।

অরুণ বলল, সেটা জানি। কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানদের কথা যেন কি বলছিলেন?

ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, রেড ইণ্ডিয়ানরা মানুষের চামড়া, রক্ত মাংস সব কিছুই নষ্ট করে কেবল কঙ্কালটাকে বার করে আনত। তারপর সেই কঙ্কাল লাল রং করে যত্নে রেখে দিত। আপনিই বলুন এ-গুলি বিকৃতি ছাড়া কি আর।

অরুণ বলল, মানুষের বিশ্বাস বড় শক্ত খুঁটি। তাকে ধরেই মানুষ বাঁচতে চায়।

সুভদ্রাদেবী বললেন, ঠিকই, আগেকার দিনে রাজা মহারাজারা মৃত্যুর পর নিজের দেহটাকে রক্ষা করার জন্য উইল করে যেতেন, প্রচুর অর্থ রেখে যেতেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় সহচর, এমন কি রাণীদেরও নিজের কাছে রাখতে চাইতেন।

অরুণ তাকিয়ে থাকে।

সুভদ্রাদেবী আবার কুকুরগুলিকে ধমকে সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমাদের দেশের সহমরণ প্রথার কথা ভাবুন না।

অরুণ বলল, সহমরণ মানে তো স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে দাহ করা।

—হ্যাঁ, দাহ করা বা কবর দেওয়া তেমন কিছু তফাৎ আছে কি? ওখানে অবশ্য দেহ নষ্ট করার রেওয়াজ ছিল না। ওরা রাণীকে বা রাজার প্রিয় সঙ্গীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখত। পরে রাজার পাশেই সেই ঘুমন্ত দেহগুলিকে তুলে এনে জ্যান্ত কবর দিয়ে রাখত।

গা শিউরে উঠল অরুণের।

কখনো বা কবর না দিয়ে প্রিয়জনদের ডামি বানিয়ে রাজার দেহের চারপাশে রেখে দিত।

—তা বরং ভালো, কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে কবর দেওয়ার কথাটা ভাবা যায় না।

সুভদ্রাদেবী বললেন, আসলে ডামিই বানাক বা কবরই দিক সবই আত্মার কথা ভেবে।

—আপনি আত্মা বিশ্বাস করেন? হঠাৎ প্রশ্ন করে অরুণ।

—আত্মা। সুভদ্রাদেবী কেমন একটু উদাস হয়ে গেলেন, পরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, আত্মা, হ্যাঁ, যাকে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায় না, যাকে আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা যায় না। শাস্ত্রে ওরকম কি একটা কথা আছে।

শ্লোকটা অরুণেরও মনে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সুভদ্রাদেবীকেই বলতে দেওয়া উচিত।

—আত্মার যে ধ্বংস নেই, এটা বোধহয় পৃথিবীর সব দেশের মানুষই বিশ্বাস করে। হিন্দুরা তো করেই। তবু ভালো হিন্দুরা দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলে আত্মা দেহের ভিতরে আবার ফিরে আসবে, একথা ভাবে না।

সুভদ্রাদেবী খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। ঘরের ভিতর ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অরুণ আবার দেয়াল ঘড়ির শব্দ শুনতে পেল। আশ্চর্য, এতক্ষণ যেন ঘড়িটা বন্ধ ছিল, যেন কান পেতে মানুষের মৃত্যু রহস্য শুনছিল। সুভদ্রাদেবী হঠাৎ কথা বন্ধ করায় আবার যেন চলতে শুরু করেছে। অরুণ ঘড়িটার দিকে তাকায়। কথা বলতে বলতে এরই মধ্যে কখন যেন দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ঘড়িতে এখন আটটা দশ।

ভদ্রমহিলা আবার কথা বললেন, কি ভাবছেন?

চমকে উঠল অরুণ, কিছু না

সাইকেল চেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরো খানিকটা এগোলেন উনি, আমি জীবিত কি মৃত জিজ্ঞেস করলেন না?

—না না, আপনি তো বেশ সুস্থ। আপনার বিচারবুদ্ধিও ভাল।

– একে সুস্থ বলে না। সুভদ্রাদেবী আবার ম্লান হাসলেন। মৃত্যু এসে আমার শরীরে এখন বাসা বেঁধেছে। দেখছেন না, কোমরের নিচের অংশটা কেমন পঙ্গু হয়ে রয়েছে। এখন এই চেয়ারে বসে বসেই যে ক'দিন কাটানো যায়।

—চিকিৎসা করেন নি? ডাক্তার কিছু বলেন নি?

—মৃত্যুর কাছে সবাই শেষপর্যন্ত হেরে যায়। আপনার বয়স কম, আপনি এখনো এ-সব বুঝবেন না। সুভদ্রাদেবী আবার কুকুরগুলোকে ধমকালেন।

অরুণ হাসল, ফোনেও আপনি ওই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আমি সব দিক ভেবেই এখানে এসেছি।

—এসে কি মনে হচ্ছে আমাকে? সরাসরি আবার তাকালেন সুভদ্রাদেবী।

অরুণ বলল, আপনি যে কেন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তা এখনো আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

—কেন! আত্মা বিশ্বাস করি না বলে? বিশ্বাস এক জিনিস আর কর্তব্য আর এক।

—বিশ্বাস থেকেই তো মানুষ কাজ করে। সেইভাবেই সে এগোয়।

সুভদ্রাদেবী আবার কেমন ম্লান হয়ে গেলেন, হয়তো তাই। কিন্তু পরজীবীদের ক্ষেত্রে সে-কথা খাটে না। আমি পরজীবী।

—পরজীবী মানে?

—মানে,—কি বলতে গিয়ে আবার থেমে গেলেন সুভদ্রাদেবী। নাহ্ ও কথা থাক। আমার দায়িত্ব যদি নিতে হয় সব কথাই জানতে পারবেন। এখন অন্য কথায় আসি।

অরুণ কেমন বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। সুভদ্রাদেবী যেন নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথায় আসতে গিয়ে থেমে গেছেন।

—আপনি কি একটা লেবরেটরির কথা বলেছিলেন?

অরুণ কিছুটা বিপাকে পড়লেও নিজেকে সামলে নিল, হ্যাঁ ফসিলাইজড বডি নিয়ে সামান্য কিছু গবেষণার কাজ করছি। সামান্যই বলতে পারেন, তবে ইচ্ছে আছে বড় রকমের কিছু করি।

—আমাকে নিয়ে পরীক্ষা করতে চাইছেন?

অরুণ একটু বিব্রত বোধ করে, পরীক্ষা নয়, আপনি যেভাবে

চাইবেন তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। বাড়তি পাওনা হিসাবে যদি কিছু পেয়ে যাই।

—বাড়তি পাওনা বলতে?

অরুণ মৃদু হাসল, মানে, নতুন কিছু অবজারভেশন যদি চোখে পড়ে।

—একসপেরিমেণ্ট?

ঘড়িতে আবার সেই সুরেলা শব্দ, ন'টা।

সুভদ্রাদেবী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কেন চমকে উঠলেন, নাহ, অরুণবাবু আজ এ পর্যন্তই থাক। আপনাকে আমি এখনো সময় দিচ্ছি, ভাল করে ভেবে দেখুন।

সাইকেলের চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার খানিকটা পিছিয়ে গেলেন সুভদ্রাদেবী। তারপর দরজার দিকে মুখ করে ডাকলেন, রাধা।

রাধা বলতে সেই মহিলাটিই হবে হয়তো, যে চেয়ার ঠেলে ঠেলে সুভদ্রাদেবীকে ঘরে নিয়ে এসেছিল। অরুণ দেখল, হ্যাঁ সেই মহিলাটিই আবার পর্দার আড়াল থেকে এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকেছে। সুভদ্রাদেবীর সাইকেল চেয়ারের পেছনে হাত রাখল, আবার তাকে পর্দার ওপাশে নিয়ে যাবার জন্য ঠেলতে শুরু করল।

ঘটনাটা এমন দ্রুত ঘটে যাবে অরুণ বুঝতে পারেনি। অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করল, আমি তাহলে কবে আসব সুভদ্রাদেবী?

কুকুরগুলি অতর্কিতে লাফিয়ে এসেছিল অরুণের দিকে। সুভদ্রাদেবী ঘুরে তাকালেন, কুকুরগুলিকে ধমকিয়ে কাছে টেনে নিলেন, দু-একদিন ভালো করে ভেবে নিন, পরে আসুন। ফোন করে জানিয়ে আসবেন।

ততক্ষণে সদর দরজার দিক থেকে আবার সেই ধুতি ফতুয়া পরা লোকটা ঘরে ঢুকে অরুণকে ডাকল, আসুন, রাণীমা এখন বিশ্রাম করবেন।

সাইকেল চেয়ারটা পর্দা পার হয়ে ও ঘরে ঢুকে পড়ল। অরুণ অসহায়ভাবে বেরিয়ে এল লোকটার সঙ্গে। বারান্দায় আরো

কয়েকটা কুকুর লাফিয়ে এল অরুণের দিকে। অরুণের আবার বুক শুকিয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকটা অভয় দিল, আসুন, কিছু করবে না ওরা। আমার সঙ্গে আসুন।

বিশাল বাড়ির বারান্দা থেকে সানের দেয়াল দিয়ে ঘেরা চত্বরটাকে আশ্চর্য রহস্যময় দেখাচ্ছে। বাড়িটার চারপাশেই যে কলকাতা শহর, কে বিশ্বাস করবে!

মোরাম বিছানো সদর রাস্তা ধরে ওরা গেট অবধি এগিয়ে এসে কাটা দরজার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

একটু দাঁড়াল। অরুণ লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন।

আপনাদের রাণীমা এখানে একা থাকেন? আর কেউ নেই রাণীমার?

লোকটা কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাল, হাসল, এতক্ষণ কথা বলে এলেন, এই সামান্য প্রশ্নটাতো ওঁকেই করতে পারতেন।

—না, মানে, সে রকম কোন প্রসঙ্গই ওঠেনি। আপনি তো এ বাড়িতেই থাকেন?

—আমি ম্যানেজারের কাজ করি। সারাদিন হাজারটা ঝামেলায় আমাকে ডুবে থাকতে হয়।

—আপনার নাম?

লোকটা বলল, তারাপদ বল।

—ও আপনিই তারাপদবাবু!

—হুঁ আমিই, কেন বলুন তো, কিছু শুনেছেন নাকি আমার নামে?

অরুণ নিজেকে সংযত করে নিল, না না, কি শুনব। এ বাড়িতে ঢুকবার সময় একজন কে যেন বলছিলেন, তারাপদবাবুর নাম ধরে ডাকুন।

লোকটা চুপ করে শুনল। চোখের দৃষ্টিতে কেমন সন্দেহ।

অরুণ হেসে আরো সহজ হওয়ার চেষ্টা করল, তা যাক গে, যা জানতে চাইছিলাম, রাণীমা একা থাকেন ?

—হ্যাঁ এখানে একাই।

—কিন্তু রাণীমাকে দেখে মনে হল, ওর হাজব্যাণ্ড জীবিত। উনি কোথায় থাকেন ?

তারাপদবাবু প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, আপনার রাত হয়ে যাচ্ছে অরুণবাবু। রাণীমার কাছে তো আবার আসবেন, সব জানতে পারবেন সে সময়

লোকটা যেন এই প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াতে চাইছিল না।

অরুণ চুপ করে গেল, ঠিক আছে, আসি তাহলে

—আসুন। তারাপদবাবু আবার কাঠের দরজার ভেতর দিয়ে বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়লেন। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন।

অরুণ হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ওপাশে সেই চা আর সিগারেটের দোকানটা দেখা যাচ্ছে মনে পড়ল, গতকাল ঠিক এ সময়ই ও আর ব্রতীশ বার্মিজ ভিলা সম্পর্কে আগাম কিছু জানার জন্য এসেছিল। কিন্তু সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে দেখা করার পরও অরুণ বেশি কিছু জানতে পারল কি! আশ্চর্য, ঘণ্টা দুয়েক সুভদ্রা-দেবীর সঙ্গে কথা হল, কিন্তু যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

দেখা যাক, কত দূর কি গড়ায়। কাল অথবা পরশুই আর একবার আসতে হবে। আর দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটা শুরু করে দেয় অরুণ। চারপাশে একবার তাকায় একটা ট্যাকসি পেলেই সুবিধে হত ওর।

খানিকটা দূর এগিয়ে এসে, হঠাৎ ওর মনে হল কে যেন ওরই পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে এসেছে অরুণ থমকে দাঁড়াল।

আর এমন সময় সেই রহস্যময় লোকটা ওর কোমরের দিকে একটা শক্ত নল মতো কিছু যেন ঠেকিয়ে ধরেছে। লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে ফিসফিস করে বলল, দাঁড়াবেন না। ওই যে ট্যাকসিটা দেখছেন, সোজা গিয়ে উঠে পড়ুন।

অরুণের গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। একটা রিভলবারই ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটা। পরনে একটা লুঙ্গি, গায়ে জাল জাল গেঞ্জি, মুখটা কেমন রহস্যে ভরা, দাঁড়িতে ঢাকা।

লোকটাকে কোনদিন দেখেছে বলে পড়ল না অরুণের। অসহায়-ভাবে বলল, কি করেছি আমি, কি চান?

—না কোন কথা নয়, সোজা ওই ট্যাকসিতে উঠুন আগে। আর বেগরবাই করার চেষ্টা করলে লাশ নেমে যাবে। চলুন।

অরুণ বুঝল, ঘনীভূত এক রহস্য-চক্রের মধ্যে ও জড়িয়ে গেছে। এ কী সুভদ্রাদেবীরই চক্রান্ত, না আর কিছু। উপায় না দেখে সামনেই কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাকসির দিকে হাঁটতে শুরু করে অরুণ। জায়গাটা বেশ নির্জন। তাছাড়া লোকটা এমনভাবে ওর কোমরের কাছে রিভলবার ধরে রেখেছে যাতে ওরা রাস্তায় কারো চোখে পড়লেও সন্দেহ করার উপায় নেই। ঘনিষ্ঠ পরিচিত লোকেরা সাধারণত ওভাবেই হেঁটে থাকে।

অরুণ ট্যাকসির কাছে এগিয়ে দেখল, ড্রাইভার এক অবাঙ্গালী ছোকরা, স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বসে আছে। নির্বিকার।

লোকটা আদেশ করল, উঠুন। উঠে পড়ুন।

অরুণ অস্ফুটভাবে শুধাল, কোথায় নিয়ে যেতে চান আমাকে? কি করেছি আমি?

—আগে উঠুন, পরে কথা।

লোকটার আদেশ করার ভঙ্গি বড় অদ্ভুত। পরনে লুঙ্গি গেঞ্জি থাকলেও কথায় কোন অশিক্ষার ছাপ নেই। কিন্তু সত্যি সত্যি কি চায় লোকটা! যদি টাকা পয়সা ছিনতাই করারই উদ্দেশ্য থাকে,

তাহলে ওকে ট্যাকসিতে তোলার দরকার কি! পিঠে রিভলবার ঠেকাবার পরই টাকা ঘড়ি চেয়ে নিতে পারত। অসহায় অরুণ হয়তো তাও দিতে বাধ্য হত। কিন্তু ট্যাকসিতে তুলে নিয়ে ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় লোকটা।

উপায় না দেখে ট্যাকসিতে উঠে বসল অরুণ। উঠল লোকটাও। উঠে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, চলিয়ে ড্রাইভারজী, সিধা ডোভার লেন।

—ডোভার লেনে কোথায়? প্রশ্ন করে অরুণ। অসহায় দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকায়।

লোকটা তখনো ওর পাশটিতে বসে গায়ে সেই অস্ত্রটি ঠেকিয়ে রেখেছে। ড্রাইভার নির্বিকার, ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

লোকট৷ মৃদু একটু হাসল, ডোভার লেন চেনেন না? যেখানে আপনার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে রঘুনাথজী।

আবে অস্বস্তিতে পড়ে অরুণ, রঘুর নাম জানল কি করে! তাছাড়া ওব বাড়ি ডোভাব লেনে তাই বা বুঝল কি করে!

যাক গে, কাজের কথা আসা যাক। সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে কি কি কথ হল আপনার? ভদ্রমহিলাকে দেখে কি মনে হল?

অরুণ কিছুই বুঝতে পারছিল না। সুভদ্রাদেবীব পেছনেও কি কোন চক্র ঘুরছে। ও কি এখন সেই চক্রেব হাতে ধরা পড়েছে। কেমন গোলোকধাঁধা।

—কি হল, মুখ খুলবেন না? লোকটা আবার ঝাঁজাল গলায় প্রশ্ন কবল।

অরুণ অসহায়ভাবে বলল, কি কথা, কিছুই না। এমনিই দেখা করতে গিয়েছিলাম। দয়া করে ওই অস্ত্রটা একটু সরান না।

লোকটা আবার একটু হাসে, ভদ্রমহিলা নিজের দেহটা প্রিজার্ভ করতে চান কেন? নিশ্চয়ই আপনি তাঁর দায়িত্ব নেবেন বলে এসেছেন?

—বলছি তো, ও-সব নিয়ে কোন কথাই হয়নি। এমনি দেখা করতে গিয়েছিলাম।

—কোন কথাই হয়নি! আপনি জেনেশুনেই আপনার মৃত্যুকে ডেকে আনছেন অরুণবাবু। আপনি আগুন নিয়ে খেলতে চাইছেন।

অসহায়ভাবে প্রায় কাঁকিয়ে ওঠে অরুণ, বিশ্বাস করুন, একটুও মিথ্যে বলছি না। ও-সব ব্যাপারে কোন কথাই হয়নি।

—কি ব্যাপারে কথা হয়েছে তাহলে ?

অরুণ আবার করুণ গলায় বলল, ওটা সরান না। এভাবে কথা হয় না।

—বেশ, সরাচ্ছি, কিন্তু সাবধান একটু গোলমাল করার চেষ্টা করলে আপনিই বিপদে পড়বেন।

লোকটা রিভলবারটা সরিয়ে নিল। তারপর এমনভাবে পা গুটিয়ে বসল, যাতে অরুণ ঝট করে যে ওকে কাবু করে ফেলবে তারও উপায় নেই।

—বলুন, কি কথা হয়েছে ওর সঙ্গে ? লোকটা আবার প্রশ্ন করে।

অরুণ মুহূর্তের মধ্যেই ভেবে নিল, সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে সত্যি সত্যি ওর যা কথা হয়েছে তা বলে ফেললেও কিছু আসে যায় না। ফলে, বলতে বাধা কি! বলল, মানুষ মরে গেলে পৃথিবীর কোথায় কোথায় কিভাবে দেহটাকে রেখে দেওয়া হয়, সে-সব নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

—ব্যাস, এই কথা হয়েছে ? আর কিছু নয় ?

—কেন যে মানুষ মৃতদেহ রাখার কথা ভাবত, তাও কিছু কিছু উনি বললেন। এই যেমন মানুষ মরে গেলেও তার আত্মা মরে না, থেকেই যায়, আবার হয়তো কোন দিন সেই দেহে আত্মাটা ফিরে আসতে পারে, এই সব।

লোকটা আবার একটু হাসল, তাহলে আপনি যে উদ্দেশ্যে ও বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন তার কিছুই পাননি ?

বলতে বলতে লোকটা একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল, নিজের মাথায় হাত দিয়ে ঝট করে পরচুলাটা খুলে ফেলল। শুধু পরচুলাই নয়, গালভরা দাড়িও হঠাৎ টান দিয়ে খুলে ফেলে হো-হো করে হেসে উঠল।

অরুণ অবাক। আরে, ব্রতীশ তুই!

—হুঁ আমি। কেমন মেকআপ নিয়েছিলাম বল। কেমন তোকে ভেড়া বানিয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে এলাম।

অরুণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সত্যি ওর বোঝা উচিত ছিল।

—তুই বিকেলে যখন ও বাড়িতে গিয়ে ঢুকলি তখন থেকেই আমি বাড়িটাকে ওয়াচে রেখেছিলাম। যেমন পাড়া, তেমনি মেক আপ।

—এসব যে করবি আমাকে কিন্তু কিছুই বলিসনি

—ইচ্ছে করেই বলিনি।

—কেন?

—কতটা তোর উপস্থিত বুদ্ধি, তা পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছিলাম।

অরুণ হাসে, পিঠে রিভলভার ঠেকানো থাকলে কোন উপস্থিত বুদ্ধিতেই কাজ হয় না। ফলে বিশ্বাস কর, এতক্ষণ তোকে যা যা বলেছি তাই ঘটেছে ও বাড়িতে। সুভদ্রাদেবী ও বাড়িতে রাণীমা নামে পরিচিত। বয়স পঞ্চাশেরও বেশি, কিন্তু ভীষণ রুগ্ন। কোমরের নিচের দিকটা প্যারালিটিক। সাইকেল চেয়ারে বসে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেন। আর কাল সেই চায়ের দোকানে বলছিল না, ও বাড়িতে মেলাই কুকুর। কথাটা সত্যি। কম করেও পনের ষোলটা কুকুরের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল।

—আর যে লোকটার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলি, সে কে?

অরুণ বলল, ওই সেই তারাপদবাবু। বাড়ির ম্যানেজার, আসলে নায়েব গোমস্তা আর কি। পুরো নাম তারাপদ বল।

—কি বলে লোকটা ?

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় বলে একটা কথা আছে না, ও হচ্ছে তাই। কিছুতেই মুখ খুলল না।

ততক্ষণে ট্যাকসিটাও ডোভার লেনে ঢুকে পড়েছিল। ব্রতীশ বলল, তোকে নামিয়ে দিয়ে আমি ট্যাকসিটা বাড়ি নিয়ে যাব।

—একটু বসে যাবি না ?

—মাথা খারাপ, লুঙ্গি আর এই জালি গেঞ্জি পরে তোর বাড়িতে ঢুকলে শ্রীমান রঘুনাথ মূর্ছা যাবে। তা ছাড়া রাতও হয়ে গেছে। তুই কি কালই আবার ওদিকে যাবি ? প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

অরুণ আমতা আমতা করে, ব্যাপারটা বুঝতে হলে আরো দু'একটা সিটিং লাগবে। কাল সকালেই একবার ফোন করে কথা বলে নেব। তারপর দেখা যাক।

—ঠিক আছে, কি হয় জানাস। যখন যা সাহায্য লাগবে বলিস।

অরুণ মাথা নাড়ে, ঠিক আছে। তারপর ট্যাকসি থেকে নেমে পড়ে অরুণ। ব্রতীশ হাত তুলে বিদায় জানিয়ে ট্যাকসি নিয়ে ঝড়ের বেগে মিলিয়ে গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল অরুণের। রঘুটা কখন যে চা রেখে গিয়েছিল মাথার কাছে, খেয়ালই নেই, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। পুরোপুরি ঘুম ভাঙতে অরুণ স্লিপিং গাউন সমেত বাথরুমে যেতে যেতে আর একবার তাড়া লাগাল রঘুকে, চা দে।

রঘু রান্নাঘর থেকে উত্তর করল, যাই বাবু।

—আসতে হবে না ব্যাটা, আগে চা কর। বলতে বলতে অরুণ বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

আর এ সময় ওর কালকের সন্ধ্যার ঘটনাটা হুবহু মনে পড়ে

গেল। চোখের ওপর ভেসে উঠল সুভদ্রাদেবীর করুণ মুখখানা। যৌবনকালে ভদ্রমহিলার চেহারায় যে আভিজাত্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কি রকম না পঙ্গু হয়ে যায়।

সত্যি সত্যি কি ভদ্রমহিলা মৃত্যুর পর নিজের দেহটাকে রক্ষা করার জন্য ব্যগ্র। সত্যি কি এজন্যই উনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কি জানি, ভদ্রমহিলার কথা শুনে কিন্তু বিপরীতটাই মনে হয়েছে অরুণের। তবে কেন এই বিজ্ঞাপন! নাকি সম্পত্তিগত কোন গোলমাল রয়ে গেছে, যা কাটাতে এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নেই।

অরুণের মনে হল, বিন্দুমাত্র রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজে পায় নি ও। অথচ যেভাবেই হোক রহস্য ওকে বার করতেই হবে। যত ঝুঁকিই থাক, শেষ দেখা একবার দেখতেই হবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে অরুণ। আর ঠিক এ সময়ই কলিং বেলের শব্দ। কে রে বাবা! এই সকালে আবার কে ডাকে! রাতের পোশাক পাল্টে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি সরে যায় ও।

খানিকক্ষণ পর রঘু ভেতরে ঢোকে, সেই লোকটা দাদাবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—সেই লোকটা! বোকার মতো তাকায় অরুণ।

—সেই যে সেদিন আপনার খোঁজ করতে এসেছিল। আপনি কখন থাকেন, কি করেন জানতে এসেছিল।

অরুণ গম্ভীর হয়ে গেল, বসতে দে।

—বাইরের ঘরে বসিয়েছি বাবু।

—ঠিক আছে, তুই চা কর।

দ্রুত জামাটা গায়ে চাপিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ে অরুণ, আরে আপনি, এই সকালে!

তারাপদবাবু হাত তুলে নমস্কার জানালেন। পরনে সেই কালকের মতোই পোশাক, গায়ে একটা ফতুয়ার মতো জামা, প্রায় হাঁটু অবধি

উঠে আসা ধুতি। হাতে একটা কাপড়ের থলি, তাতে বেশ কিছু কাগজপত্র খাতাটাতা রয়েছে বলে মনে হল ওর।

হাত তুলে প্রতি-নমস্কার জানাল অরুণও, বসুন। তারপর মৃদু একটু হেসে প্রশ্ন করল, তা, এই সকালে যে, কি মনে করে?

তারাপদবাবু ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, রাণীমা পাঠিয়ে দিলেন, তাই।

—রাণীমা! আগ্রহে এগিয়ে বসল অরুণ, কি হয়েছে?

—আপনাকে আজই একবার দেখা করতে বলেছেন।

—অরুণ উৎসহে বলল, কখন? উনি ভাল আছেন নিশ্চয়ই?

তারাপদবাবু চোখ নামিয়ে বললেন, ভাল আর বলি কি করে, কাল তো নিজের চোখেই দেখলেন, উনি অসুস্থ। সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে কথা বলার পর আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সারারাত ঘুমোতে পারেন নি, কেবল ছটফট করেছেন।

—কেন?

তারাপদবাবু পা গুটিয়ে বড় অদ্ভুতভাবে বসেছিলেন, কেমন সঙ্কোচ ভাব। কাপড়ের থলিটা সোফার একপাশে রাখলেন, ও-রকম প্রায়ই হয়। একটু উত্তেজনা বাড়লেই ও-রকম হয়।

—কাল কি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন? আমি তো ঠিক বুঝতে পারি নি। ডাক্তার ডেকেছিলেন?

—ডাক্তার তো রোজই আসেন, দেখে যান। আসলে রাণীমা একটু অল্পতেই আজকাল বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা, এই বুঝি চোখ বুঁজলেন। আর সে জন্যই একজন বিশ্বস্ত কাউকে উনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অরুণ আবার বোকার মতো তাকায়, পরক্ষণেই বলে, আমাকে কিন্তু উনি নির্ভাবনায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি সমস্ত দিক ভেবেচিন্তেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

তারাপদবাবু চারপাশে আবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, আরো

কয়েকজন অবশ্য বিজ্ঞাপনের উত্তরে সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু উনি একমাত্র আপনাকেই আবার কথা বলার জন্য ডেকেছেন।

অরুণ একটু রোমাঞ্চিত হল। কি বলছেন আমার সম্পর্কে ?

—বলাবলির কি আছে, আপনি সন্ধ্যার দিকে যাবেন। আমি উঠি তাহলে।

রঘু ততক্ষণে চায়ের ট্রে হাতে ঢুকে পড়েছে।

– এই তো চা এসে গেছে, বসুন।

তারাপদবাবু গুটিয়ে আবার বসে পড়লেন।

রঘু চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। বিস্কুটের ডিসটাও সামনে রাখল। তারপর সন্দেহের চোখে তারাপদবাবুর আপাদমস্তক একবার দেখে নিল।

অরুণ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল, আচ্ছা. একটা কথার জবাব দেবেন তারাপদবাবু, আপনাদের রাণীমার এ-রকম একটা বাসনা জাগল কেন ? সত্যি করে বলুন তো, কি ব্যাপার ?

তারাপদবাবু এক পলক রঘুর দিকে তাকালেন, যেন এ-সব ব্যাপার তৃতীয় কোন ব্যক্তির সামনে আলোচনা না হওয়াই ভালো।

অরুণও রঘুর দিকে তাকাল, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? বাজারে যাবি না ? রঘুকে চোখের ঈশারায় সরে যাবার নির্দেশ দেয় ও।

খানিকটা বিরক্তি নিয়েই ঘর ছাড়ল রঘু। দরজার ওপাশে ও চলে যাবার পর অরুণ আবার জের টানল, বলুন তারাপদবাবু ? উনি কি এটা স্বেচ্ছায় চাইছেন, না চাপে পড়ে ?

তারাপদবাবু খানিকটা উদাসভাবে বললেন, কি বলব বলুন, রাজ পরিবারে ও-রকম অনেক রহস্যই থাকে ! সব রহস্য কি সব সময় বোঝা যায় !

—তা হয়তো যায় না। অরুণ আবার চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল,

কিন্তু আপনি তো ও বাড়িতে অনেকদিন ধরে রয়েছেন। কত বছর আছেন?

তারাপদবাবু হাসলেন, জন্ম থেকেই আছি। আমার বাপ ঠাকুরদাও ও পরিবারে চাকরি করে গেছে।

—তাহলে তো ও-বাড়ির অনেক সুখদুঃখের সঙ্গে আপনারা পরিচিত। অনেক কিছুই আপনারা দেখেছেন? রাণীমাকেও আপনি ভালভাবেই চেনেন।

তারাপদবাবু পা গুটিয়ে আরো একটু জড়সড় হলেন, মানুষকে কি এত সহজে চেনা যায় অরুণবাবু! মানুষ নিজেকে নিজেই চিনতে পারে না, রাণীমা তো অনেক দূরের ব্যাপার। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, তবে এটুকু শুধু বলতে পারি, একটা অভিশপ্ত রাজ পরিবারের সমস্ত স্মৃতি আগলে বসে আছেন রাণীমা। ওই বার্মিজ-ভিলার প্রতিটি ঘরে এখনো সেই স্মৃতিকে অনুভব করা যায়।

—কি রকম?

তারাপদবাবুর মুখখানা কেমন ম্লান হয়ে উঠেছিল, আপনি তো ও বাড়ির সমস্ত স্মৃতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছেন, কয়েকদিন ও বাড়িতে গেলেই সব জেনে যাবেন।

অরুণ কথা হাতড়াতে থাকে, বলল, রাজপরিবার বলছেন, ও-বাড়ির পূর্ব পুরুষরা কি রাজা মহারাজা ছিলেন?

—কেন, রাণীমার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন নি? পাল্টা প্রশ্ন তারাপদবাবুর।

অরুণ তাকিয়ে থাকে।

তারাপদবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। এখন ওঁরা ছন্নছাড়া হয়ে গেছেন। তা ছাড়া কি জানেন, শুনেছি বহুদিন আগে ভারত ব্রহ্মদেশ সীমান্তের কাছাকাছি একটা পার্বত্য রাজ্যে এই বংশের রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। বার্মিজ ভিলাটা ওই রাজপরিবারেরই একজন হয়তো বানিয়েছিলেন।

—কিন্তু রাণীমার কথা অনুযায়ী বাড়িটা তো তিনশ বছরের পুরনো। তবে ও-রকম নাম হয় কি করে?

তারাপদবাবু তাঁর কাপড়ের থলিটা কোলের ওপর তুলে নিলেন এবার। ইংরেজি 'ভিলা' শব্দের জন্য বলছেন তো? আসলে বাড়িটার আগেকার নাম ছিল বার্মিজ কুঠি। ইংরেজ আমল শুরু হওয়ার অনেক আগেই পার্ক সার্কাসের জমিটা ওঁরা কিনে রেখেছিলেন। একটা কুঠিও তৈরি করা হয়েছিল সেখানে। পরে সেই কুঠি ভেঙ্গে ফেলে নতুন বাড়ি তৈরি করা হয়। নাম রাখা হয় বার্মিজ ভিলা। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও বাড়িটার বেশ জমজমাট চেহারা ছিল। কিন্তু তারপর থেকেই হতচ্ছাড়া অবস্থা। তবু রাণীমা বাড়িটা আগলে রেখেছেন বলে ওটা আজও টিঁকে আছে।

রাণীমা ছাড়া রাজপরিবারে আর কেউ নেই?

—থাকবেন না কেন, সবাই আছেন। তবে এখন আর কেউ এখানে এসে থাকতে চান না।

—কেন? কোথায় থাকেন তাঁরা?

—সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন। কেউ কেউবা এদেশ ছেড়ে চিরকালের মতো চলেই গেছেন। যদি বা কেউ কখনো দেশে আসেন, গ্র্যাণ্ডে বা রিজে ওঠেন। এ-বাড়ির দিকে ভুলেও তাকান না।

—রাণীমার হাজব্যাণ্ড?

তারাপদবাবু ঘরের চারপাশে আবার একবার চোখ বুলিয়ে নেন, না, তিনিও বার্মিজ ভিলাকে ত্যাগ করেছেন। কলকাতায় এলেও এখানে ওঠেন না।

—কোথায় থাকেন উনি?

তারাপদবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন, সবই জানতে পারবেন, রাজাবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়ও হয়ে যেতে পারে। এবার আমি উঠি। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

—রাজাবাবু! বিস্ময়ে তাকায় অরুণ।

—হ্যাঁ, যাঁর কথা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন, সেই দনুজদলন দেববর্মন। উনি নির্জন এক পার্বত্য দেশে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাবেন বলে স্থির করে নিয়েছেন।

—পার্বত্য দেশে! কোথায়? সেই ব্রহ্ম দেশে?

—না, রাজ্যপাট বহুকাল আগেই ওদের চুকে গেছে। এখন উনি থাকেন নীলঝোরায়। নীলঝোরার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? অবশ্য নীলঝোরা বললে ঠিক বলা হয় না, নীলঝোরা থেকে প্রায় দু'কিলো মিটার দূরে নীল টেম্পল নামে একটা জায়গা আছে সেখানে।

অরুণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, নীলঝোরা নামটা খুবই পরিচিত, কিন্তু ঠিক যে কোথায় মনে করতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, নীলঝোরা বিহারে কি?

—না, উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং থেকে যাওয়া যায়। কার্শিয়ং থেকেও। নীলঝোরা আসলে একটা টুরিস্ট স্পট। ওখানে বন বিভাগের বাংলোও আছে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই ওখানে বরফ জমে থাকে।

—আর নীল টেম্পল?

তারাপদবাবু আবার একটু গম্ভীর হলেন, সে সব কথা রাণীমাই আপনাকে বলবেন। আমি এবার উঠি অরুণবাবু।

অরুণ প্রায় হাত ধরে তারাপদবাবুকে আবার বসিয়ে দিল, ঠিক আছে, নীল টেম্পল সম্পর্কে নাই বললেন, আর একটা প্রশ্ন, ওখানে কি সেই রাজাবাবু একা থাকেন?

—না, একা নন। বড় রাণীমাও ওখানেই থাকেন।

—বড় রাণীমা! অরুণ অবাক। ভদ্রলোকের কটি স্ত্রী?

—বড় রাণীমা আর ছোট রাণীমা। ছোট রাণীমার সঙ্গে পরিচয় তো আপনার হয়েছেই।

—সন্তান?

—বড় রাণীমার সন্তানাদি কিছুই হয়নি।

—আর ছোট রাণীমার ?

—দুটি কন্যা। কিন্তু দু'জনেই সমস্ত যোগাযোগ গুটিয়ে বিদেশে চলে গেছে।

—কেন, মেয়েরা মাকে ত্যাগ করল কেন ?

তারাপদবাবু এবার কাপড়ের ব্যাগটা হাতে তুলে সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালেন, বলেছি তো, ও বাড়ির সঙ্গে যখন নিজের ভাগ্যটাকে জড়াতে চেয়েছেন, সবই জানতে পারবেন। আজ সন্ধ্যের আগেই আসছেন তো ?

অরুণ বুঝল, আর আটকে রাখা যাবে না লোকটাকে। বলল, নিশ্চয়ই যাবো। তবে দয়া করে গেটের কাছে যদি অপেক্ষা করেন খুব ভাল হয়। কুকুরগুলোকে মশাই একদম ভরসা পাই না।

তারাপদবাবু একটু হাসলেন, সামান্য কুকুরেই এত ভয় !

কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটু ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল। অরুণ নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, না, তা ঠিক নয়, মিছিমিছি কেউ কুকুরের শিকার হোক, এটাও ঠিক নয়।

তারাপদবাবু আবার হাসলেন, তা ঠিকই বলেছেন। তবে কি জানেন, কুকুরগুলো রাণীমার প্রাণ। সারাক্ষণ ওদের সঙ্গেই উনি থাকতে ভালবাসেন।

অরুণ আর কথা বাড়াল না।

—তাছাড়া একটা কথা, কুকুর কিন্তু মানুষের চেয়েও বিশ্বস্ত জীব। রাণীমা এটা ভালই বোঝেন। আমি চলি তাহলে। ধীরে ধীরে দরজা ডিঙিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন তারাপদবাবু।

অরুণ ঠায় বসে রইল। ওর উচিত ছিল তারাপদবাবুকে সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দেওয়া। কিন্তু লোকটা কি ওকে একটু খোঁচা দিয়ে গেল। কুকুর বিশ্বস্ত জীব এ কথা বলে কি অরুণ সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করে গেল লোকটা। পরক্ষণেই মনে হল,

তা কেন, কুকুর তো বহু লোকেই পোষে, ভালবাসে। সে কি কেবল তাদের বিশ্বস্ততার জন্য। কি জানি, কি মনে করে শুনিয়ে গেল কথাটা।

—দাদাবাবু?

—হঠাৎই আবার চমকে উঠল অরুণ।

—চলে গেছে দাদাবাবু?

—দেখতেই তো পাচ্ছিস।

রঘু টেবিলের ওপর ছড়ান কাপ-ডিস তুলতে তুলতে মুদ্রাদোষে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিল, লোকটা কে দাদাবাবু? ওর চোখদুটো দেখছেন?

অরুণ উঠে বসল, দেখেছি

—এই লোকটাই সেদিন আপনার খোঁজ নিতে এসেছিল, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা।

—তা আসতে পারে, আমার সম্পর্কে ওদের খোঁজ নেওয়াটাই স্বাভাবিক।

—কেন দাদাবাবু? লোকটা কে? রঘু আবার কাঁধ ঝাঁকায়।

অরুণ বলল, সে সব পরে শুনিস, এখন তাড়াতাড়ি আমাকে একটা প্যাড দে। চিঠি লিখতে হবে।

রঘু জবুথবুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি হল? দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ঠিক আছে বাবা, সবই বলব, সবই জানতে পারবি, এখন প্যাড দে। আচ্ছা থাক, চিঠি লেখার দরকার নেই, তুই বরং ব্রতীশকে একটা খবর দিয়ে আয়, তাহলেই হবে।

রঘু তবু অনড়।

—বলবি, বার্মিজ ভিলা থেকে লোক এসেছিল, আজ সন্ধ্যায় আবার আমি ও বাড়িতে যাচ্ছি। সুভদ্রাদেবী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

—বার্মিজ ভিলা? রঘুর চোখে জিজ্ঞাসা।

—হ্যাঁ, বার্মিজ ভিলা বললেই ও বুঝতে পরাবে। আমি যে আজই আবার ও বাড়িতে যাচ্ছি এ কথাটা ওকে জানিয়ে রাখা দরকার। কি রে, মনে রাখতে পারবি তো? বার্মিজ ভিলা।

রঘু কাঁধ ঝাঁকায়, তা আমি ঠিক বলে আসব বাবু। তবে, কি যে আপনি করে বেড়াচ্ছেন, আমার ভাবনা হয়। চোর ডাকাত কি খুনীর পেছনে ছুটোছুটি করলে এক কথা ছিল, কিন্তু মড়া মানুষ নিয়ে কি সব কাণ্ড করছেন, আমার বুক শুকিয়ে আসে দাদাবাবু। আমার মন বলছে, কাজটা ভাল হচ্ছে না।

—তাই বুঝি। অরুণ একটু গলা তুলে হাসে, তার মানে দাদাবাবুকে তুই খব ভালবাসিস?

—বাহ্, এত বছর সঙ্গে সঙ্গে রইলাম। গলা কেমন ভারি হয়ে আসে রঘুর। আমার আপনজন বলতে আর কেইবা আছে দাদাবাবু!

আবার একটু হাসে অরুণ, তারপর রঘুর পিঠে হাত রেখে বলে, ঠিক আছে, আজ আর একবার ঘুরে আসি, এসে সব তোকে বলব। যা, পালা এবার।

রঘু কাপ-ডিস তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

যথাবহিত সন্ধ্যার খানিকটা আগেই অরুণ বার্মিজ ভিলার সামনে এসে হাজির হল। সদর গেটের কাটা দরজাটা কালকের মতোই খোলা রয়েছে। আজ আর ইতস্তত করার দরকার নেই। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে সুড়ুৎ করে কাটা দরজার ভেতর দিয়ে বার্মিজ ভিলার চৌহিদ্দিতে ঢুকে পড়ে ও।

ভেতরে ঢুকেই দেখতে পেল, সেই ধাপ ধাপ সিঁড়ি-বারান্দায় তারাপদবাবু দাঁড়িয়ে অছে। খানিকটা স্বস্তিবোধ করে অরুণ।

তারাপদবাবু হাত তুলে ডাকলেন, আসুন অরুণবাবু! উঠে আসুন।

অরুণ উৎসাহিত হয়। দেরি হয় নি নিশ্চয়ই? কুকুরগুলো কোথায়?

—ভয় নেই, রাণীমা আজ ওদের আটকে রেখেছেন। লোক এলে বড্ড জ্বালাতন করে ওরা।

অরুণ খানিকটা স্বস্তি পেল। যাক বাবা, একটা ঝামেলার হাত থেকে অন্তত বাঁচা গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে বারান্দায় উঠে আসে ওরা। তারাপদবাবু ঘরের দিকে দেখিয়ে বললেন, ঢুকে যান, কোন অসুবিধা হবে না। উনি অপেক্ষা করছেন।

—কাল যে ঘরে ঢুকেছিলাম সেখানেই?

—হ্যাঁ সেখানেই।

অরুণ ভেতরে পা বাড়াবার আগে আর একবার দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

—যান না, কোন ভয় নেই, যান।

এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে অরুণ। ঢুকতেই সেই পরিচিত ঝাড় লণ্ঠন, মেঝেতে নরম কার্পেট, একপাশে সেই সোফা সেট সবই ওর চোখে পড়ে। দেখল, কালকের মতো আজও ঘরটা ফাঁকা। গতকাল এ ঘরে তারাপদবাবু ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘরের ওপাশের পর্দার দিকে ও তাকাল, গতকাল ওই পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘরে বসে ও রাণীমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আজও কি ও ঘরেই ওকে ঢুকতে হবে। কিন্তু ফাঁকা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে অরুণ। আর এই সময় ভেতরের ঘর থেকে একজন মহিলা এসে এ ঘরে ঢোকে। অরুণ চিনতে পারল মহিলাটিকে। এ সেই মহিলা, কাল যে সুভদ্রাদেবীর সাইকেল চেয়ার ঠেলে দেওয়ার কাজ করেছিল। কি নাম যেন, হ্যাঁ মনে পড়েছে, রাধা।

অরুণ কিছু বলার আগেই মহিলাটি বলল, এ ঘরেই বসুন।

মহিলাটির পরনে বিধবাদের মতো পোশাক। গায়ে সাদা জামা, সাদা থান, পায়ের চপ্পলটাও সাদা রংয়ের। বয়স কিছুতেই তিরিশের বেশি হতে পারে না। শরীরের বাঁধন বেশ চোখ টানে। চাকরির দায়েই হয়তো এই অদ্ভুত বাড়িতে এসে পড়ে আছে। কিংবা কি জানি অন্য কোন কারণও থাকতে পারে।

—কি হল, বসুন। চা খাবেন, না কফি?

অরুণ কেমন অবাক হয়। গতকাল ঘণ্টা তিনেক এখানে ও কাটিয়ে গেছে, চা বা কফি দূরের কথা, এক গ্লাস জলও এরা অফার করেনি। আজ একটু যেন অন্য রকম।

অরুণ সোফার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ে। বলল, চা বা কফি কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই, তবে ও-সব না হলেও চলে। রাণীমা কোথায়?

রাধাও এগিয়ে এসে অরুণের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ে। রাণীমাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আগে কফি খেয়ে নিন, তারপর চলুন বাড়ির ভেতরে কয়েকটা ঘর আপনাকে দেখিয়ে আনব।

অরুণ কেমন অবাক হল, ভেতরের ঘর! কি আছে সেখানে?

রাধা স্বাভাবিক গলায় বলল, রাজ পরিবারের কথা জানতে হলে ঘরগুলো আপনার দেখা দরকার। রাণীমার ইচ্ছা ঘরগুলো আপনি দেখে নেন।

—কেন? কি আছে সেখানে? আবার প্রশ্ন করে অরুণ।

রাধা তেমনি স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দেয়, চলুন না, গেলেই দেখতে পাবেন। রাজ পরিবারের কিছু স্মৃতি এখনো ধরে রাখা আছে ওই সব ঘরে। আপনি অনুভব করতে পারবেন।

অরুণ তাকিয়ে থাকে। রাণীমা কি ইচ্ছে করেই আজ ওকে এড়িয়ে গেলেন, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে পেছনে! রাজ পরিবারের

স্মৃতি বিজড়িত ঘরে রাণীমা সঙ্গে থাকলে যেভাবে সব বোঝা যেত, এই মেয়েটির দ্বারা কি তা সম্ভব হবে!

ততক্ষণে কফির ট্রে হাতে আর একজন মহিলা ঘরে ঢুকল। রাধা উঠে সেই ট্রেটা তুলে এনে সেণ্টার টেবিলে বসাল।

অরুণ দেখল, কেবল কফির পটই নয়, সঙ্গে এক গাদা মিষ্টিও।

—ও কি, মিষ্টি কেন! শুধু কফি হলেই ভাল ছিল।

রাধার চোখ কেমন চকচকে, রাণীমাই পাঠিয়েছেন। আপনি না খেলে উনি কষ্ট পাবেন।

অরুণের মনে হল, একটু বেশি রকম যেন যত্ন করা হচ্ছে ওকে। কি জানি আজ কি হল এদের। অসহায়ভাবে একটা মিষ্টি মুখে পুরে নিল, তারপর কফির কাপ হাতে তুলে নিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন।

—আপনি কত বছর আছেন এ বাড়িতে?

—কেন বলুন তো? পালটা প্রশ্ন করে রাধা।

- না মানে, আপনার সঙ্গে পরিচয় হল অথচ—

—আমি রাণীমাকে দেখাশুনা করি। এছাড়া আমার আর নিজের কথা বলার মতো তেমন কিছুই নেই।

—কত বছর ধরে আছেন রাণীমার সঙ্গে?

রাধা অল্প একটু হাসল, সে অনেকদিন। লতে পারেন জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই।

অনুমানে একটা হিসেব কষে নেয় অরুণ, মেয়েটার বয়স যদি পঁচিশ-ছাব্বিশ হয়, তাহলেও এ বাড়ির অনেক কিছুই ওর জানা। বলল, তার মানে এ বাড়ির ভালো-মন্দ অনেক কিছুই আপনি দেখেছেন?

—কিছু কিছু দেখেছি।

—বড় রাণীমাকেও নিশ্চয়ই ভালভাবে দেখেছেন?

রাধা চকিতে একবার অরুণের দিকে তাকায়, তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, দেখেছি। একই বাড়িতে আছি, দেখব না কেন।

—নীলঝোরায় গিয়েছেন কখনো?

—প্রয়োজন হয়নি।

—বড় রাণীমা তো নীলঝোরাতেই থাকেন?

—হ্যাঁ ওখানেই। যুগ যুগ ধরে তিনি ওখানেই ঘুমিয়ে আছেন?

—ঘুমিয়ে আছেন? অরুণ কেমন অবাক হল, ঘুমিয়ে আছেন মানে?

—মৃত্যুর পর তো মানুষের অখণ্ড ঘুম। কলকাতার এই বাড়িতে থাকলে কোন না কোন দিন সেই ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এই ভয়ে রাজাবাবু ওকে ওখানেই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।

—রাজাবাবু, মানে দনুজদলন দেববর্মন?

হ্যাঁ।

—আমাকে একটু খুলে বলবেন? অরুণ চোখে আকুতি মিশিয়ে তাকায়।

—নিশ্চয়ই বলব। আর তা বলব বলেই তো আপনাকে ঘরগুলো আগে দেখাতে চাই।

—বেশ তাই চলুন।

—আপনার কফি কিন্তু পড়ে আছে।

অরুণ দেখল, কফির কাপে চুমুক দিতেই ও ভুলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাপ থেকে বড় একটা সিপ নিয়ে হাসল, খেয়েছি, চলুন এবার।

রাধাও উঠে দাঁড়ায়, চলুন।

ঘরের বাঁদিকে দেয়াল জোড়া একটা পর্দা। পর্দা সরিয়ে একটা দরজা, নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রাধা, আসুন।

অরুণ ওকে অনুসরণ করল। দরজা ডিঙ্গিয়ে ভিতরে পা দিতেই কেমন রোমাঞ্চ বোধ করে ও। দেখল, বিরাট একটা টানেলের

মতো ধাপ ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। কয়েকটা কাঠের স্ট্যাণ্ডে ভারি মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্ষীণ কিছুটা আলো করে রাখা হয়েছে। টানেলের নিচের দিকে সরু একটা প্যাসেজের মতো।

রাধা বলল, চলুন নিচে নামি। নামতে শুরু করে রাধা।

অরুণও পেছন পেছন নামতে থাকে। তখনো পায়ের নিচে নরম কার্পেট ঠেকছে ওর।

রাধা নামতে নামতে বলল, আপনি কিন্তু ভাগ্যবান। রাণীমা আপনাকে ভেতর বাড়িতে আসার অনুমতি দিয়েছেন।

অরুণ তাকিয়ে থাকে।

একটু দাঁড়াল রাধা, বুঝতে পারলেন না? রাজ পরিবারের কেউ ছাড়া অথবা রাজবাড়িতে চাকরি করে এমন লোক ছাড়া এখানে কারো ঢোকার অধিকার নেই। ফলে বুঝতেই পারছেন—

অরুণ কৃতজ্ঞতায় তাকায়, হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।

—ফলে একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন।

অরুণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, কি কথা?

—মনে রাখবেন, যা যা দেখবেন তা বাইরে প্রকাশ করাটা আপনার উচিত হবে না। রাণীমা চান না, তাঁদের পরিবারের কথা বাইরে সবাই জানুক।

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারো সিক্রেসির আমি সুযোগ নেই না।

রাধাও ম্লান একটু হাসে, রাণীমাও তাই মনে করেন আপনি কথার খেলাপ করবেন না। তবু কখনো যদি ব্যতিক্রম হয়, রাজ পরিবারের অভিশাপ থেকে আপনিও রেহাই পাবেন না।

অরুণের মনে হল রাণীমার কথাগুলোই যেন রাধার মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ও।

—আসুন নামি। রাধা আবার নামতে শুরু করে। অরুণও মন্ত্র মুগ্ধের মতো অনুসরণ করে রাধাকে। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওরা নিচের প্যাসেজে নেমে এল। পঁচিশ-তিরিশ হাত লম্বা প্যাসেজ। দু'পাশে খান কয়েক ঘর, দরজা বন্ধ। হয়তো ওই ঘরগুলোই দরজা খুলে রাধা ওকে দেখাবে।

কিন্তু না, রাধা সটান এগিয়ে এল একেবারে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে। সেখানে আবছা অন্ধকারে অরুণ দেখতে পেল, একটা ঘোরানো সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িটা ভারি রহস্যময় মনে হচ্ছে।

রাধা বলল, দাঁড়ান, ওপরে ওঠার আগে টর্চ নিয়ে নেই। ওপরে উঠলে অবশ্য আলো পাব। কিন্তু সিঁড়িটা বড্ড সেকেলে।

দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে ছোট্ট একটা দেয়াল আলমারির পাল্লা খোলে রাধা। দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে পাল্লাটা এমন হয়ে আছে যে চট করে বোঝার উপায় নেই ওখানে ওরকম একটা আলমারি রয়েছে। রাধা একটা টর্চ বার করে আনে ওখান থেকে। টর্চটা জ্বালিয়ে সিঁড়ির ওপর ফেলে। চলুন, উঠি এবার। ওপরে জগৎতাড়িনীর বিগ্রহ রয়েছে।

দৃঢ় একটা থামের গায় সিঁড়িটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। রাধা সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে। টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে থাকে নিচে, আসুন, ধীরে ধীরে উঠুন।

উঠতে শুরু করল অরুণও। কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। বহু কালের পুরনো বন্ধ বাতাস যেন এখনো আটকে পড়ে আছে এখানে। গা ছমছম করতে থাকে ওর।

বেশ খানিকক্ষণ ওঠার পর রাধা আবার নিচের দিকে টর্চ ফেলল, বলল, সাবধানে পা ফেলবেন, সিঁড়িটা কিন্তু বহুকাল ব্যবহার হয় না। রাণীমা যখন থেকে আর হাঁটতে পারেন না, তখন থেকেই সিঁড়িটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

অরুণ সাবধানেই পা ফেলছিল তবু আরো কিছুটা সতর্ক হয়ে নিল, বলল, ওপরে ওঠার আর কোন সিঁড়ি নেই ?

রাধা বলল, আছে, কিন্তু এ সিঁড়ি দিয়েই সটান আমরা মন্দিরে পৌঁছতে পারব। আর সামান্য একটু উঠলেই আমরা মন্দিরে পৌঁছে যাব।

রাধা আবার উঠতে লাগল। টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পথ দেখাতে লাগল অরুণকে। তারপর এক সময় মনে হল যেন আকাশ দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িটা কি ছাদে উঠেছে। আশ্চর্য হল অরুণ।

হ্যাঁ, কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া পেল ওরা। সিঁড়িটা শেষ হয়েছে ছাদেই।

রাধা ছাদে উঠে আবার টর্চ ধরল অরুণের দিকে। আসুন, এই যে সামনেই জগৎতাড়িনীর মন্দির। দেবী দর্শন করবেন আসুন।

অরুণও ছাদে উঠে এল। খোলা ছাদ। সামনেই ছোট্ট একটা মন্দির মতো দেখতে পেল ও। উপরে বিশাল আকাশ। নক্ষত্র বিজবিজ করছে। মন্দিরের ঠিক সামনেই হাত দশেক দূরে একটা কাঠগড়া। মন্দিরের সামনে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে দেখে ওর ভারি অদ্ভুত লাগল।

রাধা এগিয়ে এসে কাঠগড়াটা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অরুণ বুঝতে পারল না কি করবে। অন্তত ওর যে ভক্তি শ্রদ্ধা আছে এটাই এ সময় প্রকাশ করা উচিত। ফলে যান্ত্রিকভাবে অরুণও কাঠগড়াটাকে প্রণাম করল।

রাধা আরো এগিয়ে দু' হাতে দরজা খুলে দিল মন্দিরের। কৌতুক এগিয়ে এল অরুণ। কিন্তু মন্দিরের ভিতর দিকে চোখ পড়তেই ও চমকে উঠল। ওগুলো কি! সারা দেয়ালে মালার মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে নরমুণ্ড। নিচে কালো পাথর খোদাই করা একটা মূর্তি। এত কালো যে মূর্তিটার চোখমুখও খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না।

একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে একপাশে। সেই আলোতেই যতটুকু দেখা। কিন্তু নরমুণ্ডগুলির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না অরুণ।

রাধা উবু হয়ে বসে প্রণাম করে নিল দেবীকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রাজাবাবুদের রাজ্যপাট চুকে গেছে কতকাল আগে, কিন্তু এই দেবীমূর্তিকে এখনো প্রতিদিন পুজো করা হয়। দেববর্মনদের শুভ অশুভ সব কিছুই এই দেবী নিয়ন্ত্রণ করেন।

—কি রকম? প্রশ্ন করে অরুণ।

রাধা বলল, রাজাবাবুরা যে ব্রহ্ম সীমান্তে রাজ্য গড়তে পেরেছিলেন তাও এই জগৎতাড়িণীরই কৃপায়। আজ থেকে ঠিক কত বছর আগে বলতে পারব না তবে এই বংশের সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন হংসধ্বজ দেববর্মন। হংসধ্বজের আমলে প্রতি অমাবস্যায় একটি করে নরবলী হত। আর হংসরাজা এই দেবী-মূর্তির নির্দেশ ছাড়া কোন কাজই করতেন না।

—এ-সব যে সত্যি, তার প্রমাণ আছে?

রাধা শীতল চোখে তাকাল, তেমন করে কেউই এ রাজ্যের ইতিহাস লিখে রাখার কথা ভাবেননি। ফলে ধারাবাহিকভাবে কিছুই নেই, তবে দনুজদলনের পিতৃদেব বিশ্বদেব দেববর্মন বহু অর্থ ব্যয় করে তার পূর্ব পুরুষদের কিছু স্মৃতি সংগ্রহ করে রেখেছেন। তিনিই এই বিগ্রহটি এখানে এই বাড়িতে এনে প্রতিষ্ঠা করেন।

—কোথা থেকে আনেন?

—ইংরেজদের কাছে এই বংশের রাজারা বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এক সময়, এবং তারই পরিনামে এই বিগ্রহ রাজাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক পুরুষ কেটে যাওয়ার পর বিশ্বদেব আবার স্বপ্নে আদেশ পান এই দেবীর।

অরুণ তাকিয়ে থাকে। রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো লাগছিল ব্যাপারটা।

—আদেশ পান, হিমালয়ের এক নিভৃত গুহায় দীর্ঘকাল ধরে জগৎতাড়িণী মা উপবাসী হয়ে অবস্থান করছেন। তাঁকে এনে প্রতিষ্ঠা কর।

—হিমালয়ের কোথায়?

—নীলঝোরায়।

অরুণ যেন এতক্ষণে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেল, নীলঝোরা মানে দনুজদলন যেখানে আছেন?

—হ্যাঁ, সেখান থেকেই এই দেবী-মূর্তিকে আবার উদ্ধার করে আনা হয়। সেই থেকে এই বিগ্রহকে নিয়মিত আবার সেবা করা হয়।

—বলি হয় না?

রাধা আবার শীতল চোখে তাকাল, হয় বৈকি। প্রতি অমাবস্যাতেই হয়। তবে নরবলি হওয়ার তো আর উপায় নেই, তাই প্রতি অমাবস্যায় এ-বাড়িতে একটি করে কালো রংয়ের পাঁঠা বলি চলে আসছে।

ঘিয়ের প্রদীপ দপদপ করে জ্বলছিল। অরুণ আবার দেবী-মূর্তির দিকে তাকাল, আবছা আলোয় মূর্তির মুখের ভাষা কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিন্তু দেয়ালে ঝুলন্ত নর-মুণ্ডুগুলিই যেন অতীত দিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

অরুণ গলা নামিয়ে প্রশ্ন করে, এই মুণ্ডুগুলি কবেকার?

—বিশ্বদেব দেববর্মনই এ-গুলো মূর্তির সঙ্গে সংগ্রহ করে এনেছিলেন বলে শুনেছি।

—কোথা থেকে? নীলঝোরা থেকে? অরুণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

রাধা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, সে অনেককাল আগের কথা, রাণীমাই ও ব্যাপারে ভাল জানেন। উনিই আপনাকে বলতে পারবেন।

—আপনি কিছু শোনেন নি?

রাধা অরুণের দিকে তাকাল, না, তেমন কিছু শুনিনি। ও নিয়ে

মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনও হয় নি। চলুন, রাত বাড়ছে। নিচের ঘরগুলো দেখে নেবেন চলুন।

অরুণের মনে হল, হয়তো সব কিছু জানা সত্ত্বেও, এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়তে চায় না মেয়েটা। বলল, ঠিক আছে, চলুন।

ছাদের আর একপাশে চলে এল ওরা। এখান থেকে বিশাল রাতের কলকাতার অনেকখানিই চোখে পড়ে। কার্নিশের একেবারে ধারে আসতেই বার্মিজ ভিলার সেই পেছনের ঝিলটা ওর চোখে পড়ল। ওপর থেকে ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে। ঝিলের এক পাড়ে সেই বস্তিটা, ধোঁয়ায় ধুলোয় আর অন্ধকারে একাকার হয়ে আছে, আর এক পাড়ে সেই রাস্তা। ঝিলের জল কেমন যেন আলকাতরার মতো ঘন কালো বলে মনে হল ওর। অরুণ ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত এমন কিছু বেশি নয়, সাড়ে সাত।

—আসুন। রাধা ততক্ষণে আবার সেই ঘোরানো সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। অরুণও এগিয়ে এল। সিঁড়ির ঢাকনা হিসেবে টিনের সেডটা বেশ নিচু। মাথা ঝুঁকিয়ে নেমে পড়ল ওরা। আর নামতেই আবার সেই অন্ধকার। টর্চ জ্বালল রাধা।

—সিঁড়িতে আলো রাখেন নি কেন? প্রশ্ন করে অরুণ। দিনের বেলাও বোধহয় জায়গাটা এ-রকম অন্ধকার থাকে?

রাধা টর্চ ঘুরিয়ে বলল, হ্যাঁ অন্ধকারেই রাখা হয় জায়গাটাকে। আলো জ্বালিয়ে শান্তি ভাঙার কোন মানে হয় না।

—কেন? আলো জ্বাললে শান্তি ভাঙবে কেন?

রাধা আবার টর্চ ঘোরাল, আলো মানেই তো কোলাহল, অশান্তি। এ জায়গায় কোন রকম অশান্তি হোক, রাণীমা চান না।

অরুণ চুপ করে শুনল। তারপর আবার নামতে লাগল। আচ্ছা, ছাদে উঠে মন্দিরে যাওয়ার কি এই একটাই সিঁড়ি? তাহলে রাণীমা মন্দিরে যান কিভাবে?

রাধা প্রায় সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এসেছিল, বলল, ছাদে ওঠার

জন্য ওদিকে একটা লিফট আছে। রাণীমা সেই লিফটেই ওঠেন। আমরাও লিফট দিয়ে উঠতে পারতাম, কিন্তু—

অরুণ ওর কথা কেড়ে নিল, না না, লিফটে না উঠে এদিক দিয়ে উঠেই ভাল হয়েছে। এ ধরনের ঘোরানো সিঁড়ি তো আজকাল চোখে পড়ে না, সেদিক থেকে ভালই লাগল।

বলতে বলতে অরুণও সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এল। দেখল, অন্ধকারে থমথমে হয়ে আছে প্যাসেজটা। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

রাধা টর্চটা সামনের দিকে তুলে ধরে খানিকটা এগোল, আসুন, এ ঘরেই ঢুকি আমরা।

একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রাধা। দরজায় একটু চাপ দিতেই পাল্লাদুটো খুলে গেল।

এগিয়ে এসেছিল অরুণও। দরজা খুলে যেতেই মনে হল, ভেতরের আটকা পড়া বহুকালের পুরনো এক ঝলক বাতাস যেন ওর চোখে মুখে আছড়ে পড়েছে। ভারি অদ্ভুত লাগে অরুণের।

—ঘরটা কি কখনো খোলা হয় না? প্রশ্ন করে অরুণ। তারপর আরো এগিয়ে এসে দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়ায়।

ঘরের ভেতরে অন্ধকার আরো জমাট। সেই অন্ধকারে তীরের ফলার মতো টর্চ ঘুরিয়ে রাধা একটা মোমবাতির স্ট্যাণ্ডের পাশে এসে দাঁড়াল।

অরুণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখল, মোমবাতিটা যে মাঝে মাঝে জ্বালানো হয়, তার প্রমাণ রয়েছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কেউ না কেউ তাহলে আসে এখানে।

একটা দেশলাই ঠুকে আলোটাকে জ্বালাল রাধা। বলল, বিশেষ বিশেষ তিথিতে রাণীমা এ ঘরগুলোয় এসে কিছুক্ষণের জন্য কাটিয়ে যান। নইলে প্রায় বারো মাসই ঘরগুলো বন্ধ থাকে।

—বিশেষ তিথি বলতে? প্রশ্ন করে অরুণ।

ততক্ষণে মোমবাতিটা জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় অরুণ ঘরের ভেতর তাকিয়ে কেমন চমকে উঠল। দেখল, ঘরের ঠিক মাঝখানে উঁচু বেদির ওপর একটা কাচের কফিন। কফিনে দীর্ঘদেহী একজন কে যেন শুয়ে রয়েছে। কে ও!

যত সাহসীই হোক, অরুণের বুকের ভেতরও কেমন ধ্বক করে উঠল।

কফিনটার কাছে এগিয়ে এসেছিল রাধা। হাতের টর্চটা নেভানো। মোমের আলোতেই যেটুকু দেখা।

—কি হল? দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন!

অরুণের এখন পিছিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। দরজা ছেড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লাদুটো আপনি আপনি বন্ধ হয়ে গেল। অরুণ আবার চমকে উঠে পিছন দিকে তাকাল। কেউ কি বন্ধ করে দিল! না, তাও তো মনে হয় না।

রাধা ডাকল, আসুন। এখানে স্বামী শুদ্ধানন্দ শুয়ে আছেন। ঘুমুচ্ছেন।

—স্বামী শুদ্ধানন্দ! ইনি কে?

—দেববর্মনদের কুল-গুরু। প্রায় শ'খনেক বছর আগে ইনি দেহরক্ষা করেছেন।

অরুণের বিস্ময় কাটছিল না। কাচের কফিনের কাছাকাছি এগিয়ে এল। কফিনের ওপর পাতলা একটু ধুলোর স্তর জমে আছে। ধুলোটুকু ঝেড়ে নিতে পারলে ভেতরে শায়িত লোকটাকে আরো স্পষ্ট করে দেখা যেত। তবু যা দেখা যাচ্ছে, তাতেও অরুণের বিস্ময় কাটার নয়।

অরুণ দেখল, বডিটা একটা ভেলভেটের মতো আসনে শুয়ে আছে চিত হয়ে। গলা অবধি বাঘের ছালের চাদরে ঢাকা। মাথায় জটাধরা চুল। মুখের অধিকাংশই দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। কপালে সিঁদুরের ছোপ। চোখদুটো বোজা। সত্যি সত্যি যেন ঘুমুচ্ছে।

মোমের আলো বলেই মুখের চামড়ার ভাঁজ স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু একশ' বছর ধরে বডিটা এখানে পড়ে আছে, ভাবাই যায় না। গা ছমছম করতে থাকে অরুণের।

ফিসফিস করে বলে, কত বছর বললেন?

—কি কত বছর?

—কত বছর আগে মারা গেছেন?

—তা প্রায় একশ' বছরের কাছাকাছি। ঠিক তারিখ আমার জানা নেই।

—তার মানে একশ' বছর ধরে এখানে ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছে!

অরুণ চোখ ফেরাতে পারছিল না। একশ' বছর আগে মৃত কোন বডি এভাবে সতেজ থাকতে পারে একথা কে বিশ্বাস করবে!

—হ্যাঁ। রাণীমা সে কথাই বলেন। একশ' বছরের কম নয়।

আরো ঝুঁকে বডির মুখের চামড়াটা বুঝবার চেষ্টা করল অরুণ। রাধার অলক্ষে একবার কফিনে হাত ছুঁইয়ে দেখল। নাহ্ তেমন কিছু ঠাণ্ডা নয়। তবে কি বডির গায়ে কোন কারসাজি করা আছে, কোন কেমিক্যাল টেমিক্যাল কি ব্যবহার করা হয়েছে। কফিনের ভেতর হয়তো বাতাসের বদলে অন্য কোন গ্যাস ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে, অথবা পুরোপুরি ভ্যাকুয়াম করে রাখা হয়েছে। কৌশলটা ওকে জানতেই হবে। জিজ্ঞেস করল, বডিটা এ-রকম আছে কি করে?

রাধা যেন শুনতেই পায় নি এমন একটা ভঙ্গি করে বলল, স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে বিশ্বদেব দীক্ষা নিয়েছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাবান পুরুষ। উনি বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুতেই মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুটা আসলে ঘুম ছাড়া কিছুই নয়।

আরো কিছু শোনার জন্য অরুণ তাকিয়ে থাকে।

—তবে বলতেন, মানুষের মৃত্যু-ঘুম যে ভেঙে গিয়ে মানুষটা আবার চট করে জেগে উঠে চলাফেরা শুরু করবে এমন আশাও না

করাই ভাল। আসলে আত্মাটা যতদিন না বিলীন হয়ে যাচ্ছে ততদিন ওই আধারটা রক্ষা করাই উচিত। ওতে আত্মা কখনো সখনো নিজেরই পুরনো আধারে এসে আশ্রয় নিতে পারে। বিশ্রাম নিতে পারে।

রাধা তোতা পাখির মতো বলে যাচ্ছিল, স্বামী শুদ্ধানন্দ বিশ্বাস করতেন, মানুষ জীবনভর যে কর্ম করে, সেই কর্মের একটা ফল সে ভোগ করে। কিন্তু কর্মফল অনন্ত হতে পারে না। ফলে আত্মাও নিরবধি হতে পারে না। আত্মারও শেষ আছে।

—রাণীমাও একথা বিশ্বাস করেন? প্রশ্ন করল অরুণ।

—নিশ্চয়ই করেন, না হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

—কিন্তু কাল রাণীমার সঙ্গে কথা বলে আমার অন্য কথা মনে হয়েছিল।

রাধা একটু থমকে গেল, কি কথা?

—রাণীমা বলতে চেয়েছিলেন, উনি আত্মা-ফাত্মা বিশ্বাস করেন না। মৃত্যুর পর দেহরক্ষা করার ব্যাপারটাই অর্থহীন।

—তাই যদি হবে, তাহলে এই ঘরে স্বামী শুদ্ধানন্দকে দেখবার জন্য আপনাকে উনি পাঠিয়ে দিলেন কেন?

অরুণেরও এই একই প্রশ্ন। কেমন গোলমেলে লাগছে সব ব্যাপারটা। জলজ্যান্ত একটা মানুষের দেহ এই কফিনে শুয়ে আছে, তাতো স্পষ্টই ও দেখতে পাচ্ছে। সুভদ্রাদেবী যদি সত্যি সত্যি এ সব অবিশ্বাসই করবেন, তাহলে এই গোপন ঘরে তাঁদের কুল-গুরুকেই বা মৃত্যুর পর শুইয়ে রাখবেন কেন!

অরুণ আরো বেশ কিছুক্ষণ কফিনটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, রাধাদেবী, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আসল রহস্যটা আপনিই আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন।

—কি জানতে চান বলুন?

—রাণীমাকে যতটুকু বুঝেছি, উনি এসব বিশ্বাস করেন না, তবু কেন নিজের মৃত্যুর পরের কথা এত করে ভাবছেন?

রাধা একটুক্ষণ নিরব রইল। তারপর বলল, আসলে স্বামী শুদ্ধানন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল দনুজদলন দেববর্মণের ওপর।

—যিনি এখন নীলঝোরায় আছেন? রাণীমার স্বামী?

—হ্যাঁ, দনুজদলনের বিশ্বাস ওর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। স্বামী শুদ্ধানন্দই ওকে বুঝিয়েছেন, মৃত্যুর পর দেহকে বিশুদ্ধ মতে রক্ষা করতে না পারলে আত্মার কখনোই মুক্তি হয় না। দনুজদলন মনপ্রাণ দিয়ে সে কথা বিশ্বাসও করেছিলেন।

শুদ্ধানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অরুণ, চোখ তুলল, তারপর?

—তাই নিয়ে ছোট রাণীমার সঙ্গে মনোমালিন্য। রাণীমা অনেক করে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, ও সব বাজে, ও সব কুসংস্কার, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি।

অরুণ তাকিয়েই থাকে।

একটুক্ষণ থেমে রাধা আবার বলতে শুরু করে, বড় রাণীমা একটু অন্য ধরনের মহিলা ছিলেন, উনি কখনো আপত্তি করেন নি। বরং বলা যায়, স্বামীকে আরো বেশি করে পাওয়ার জন্য উনি সব কিছুতেই রাজি ছিলেন। রাধা একটুক্ষণ থেমে আবার বলতে শুরু করে, অনেক দিন ধরেই উনি নানান ব্যাধিতে ভুগছিলেন, শেষপর্যন্ত ডাক্তাররা ওকে অনেক চেষ্টা করেও বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। বড় রাণীমা মারা যাওয়ার পর রাজাবাবু কেমন যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলেন। বড় রাণীমার দেহটাকে পাহাড়ের এক অন্ধকার গুহায় রেখে দেওয়ায় সব আয়োজন উনি আগেই করে রেখেছিলেন। মৃত্যুর পর ওর দেহটা ওখানে রেখে দিলেন।

রাধা এবার একটু থামল।

অরুণ প্রশ্ন করল, তারপর ?

—কিন্তু আমাদের ছোট রাণীমা এ-সব একেবারেই পছন্দ করতে পারছিলেন না। কথায় কথায় উত্তেজনা বাড়ত দু'জনেরই। কখনো সখনো দু'জনের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু রাজাবাবুর তখন অন্যরকম মানসিক অবস্থা। রোজই গভীর রাতে একা একা বড় রাণীমার দেহটার কাছে চলে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওখানে বসে থাকতেন। আবার ভোর হওয়ার আগেই ফিরে আসতেন।

—তারপর ?

—ছোট রাণীমা শেষটায় একদিন রাজবাবুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে চলে এলেন। চুকিয়ে দিয়ে এলেন নীলঝোরার পাট।

—কত বছর আগে ?

রাধা একটু হিসেব কষে নিল, তা বছর পাঁচেক তো বটেই।

—তার মানে পাঁচ বছর হল আপনারা এই বামিজ ভিলায় আছেন ?

রাধা বলল, হ্যাঁ, পাঁচ বছরই হবে তার বেশি নয়। তবে মাঝে মাঝেই এ বাড়িতে সবাই তখন আসতেন। কখনো সখনো দু'চার মাস করে থেকেও যেতেন। সেদিক থেকে বাড়িটার সঙ্গে যোগাযোগ ঠিকই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। এখন ছোট রাণীমার খোঁজখবরও কেউ আর করেন না। উনি এখন একা। ভীষণভাবে একা।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু রাণীমা হঠাৎ মত পাল্টে ফেললেন কেন ? দেহরক্ষা করার পাগলামীর জন্য উনি দনুজবাবুর কাছ থেকে সরে এলেন, আবার উনিই কেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেহরক্ষা করার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন ?

রাধা এবার ম্লান একটু হাসল, মানুষের মনের গভীরে কখন যে কি হয়, তা কি কেউ বলতে পারে ! রাণীমাকেই ও কথা জিজ্ঞেস করুন না !

—তা না হয় করব। কিন্তু আপনি কিছু বুঝতে পারেন না?
অরুণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

—আমি যা বুঝি, তা ভুলও হতে পারে।

—সে তো হতেই পারে। তবু আপনার মতোই আপনি যদি বলেন?

রাধা একটুক্ষণ কি ভাবল তারপর বলল, রাণীমা এই বার্মিজ ভিলায় চলে আসার পরই প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন, শত হোক স্বামীকে ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভিন্নভাবে থাকা! এরপর আরো বড় করে আঘাত খেলেন নিজেরই দুই মেয়ের কাছে। বিয়ে হয়েছিল ওদের বিদেশে। জার্মানিতে। দু-জনেই তাঁদের মাকে খুব কড়া ভাষায় চিঠি লিখে দোষারোপ করল।

—কেন? মেয়েরা কি রাজাবাবুর ও-সব কীর্তিকলাপ পছন্দ করত?

—তা ঠিক নয়। তবে মেয়েদের কথা হচ্ছে, যদি নরকেও যেতে হয়, স্বামীর সঙ্গেই যাওয়া ভাল। মেয়েদের চিঠি লিখে সব পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন রাণীমা, কিন্তু সবই বৃথা।

রাধা থামল।

অরুণ আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর?

—তারপর আর কি! যা হবার তাই হল, রাণীমার থ্রম্বসিস অ্যাটাক হল। কোমরের নিচ থেকে দু'পায়ের সমস্ত শক্তি ওর হারিয়ে গেল। আর এখন উনি সারাক্ষণ মৃত্যু ভয়ে কষ্ট পাচ্ছেন।

অরুণ আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করল।

—কেবল মৃত্যু ভয় থাকলে এক কথা ছিল, সেই সঙ্গে একটা পাপবোধও সারাক্ষণ ওকে ঘিরে রাখল।

—পাপবোধ? কি পাপ?

—পাপ নয়। রাজাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে আসা তো আর পুণ্যের কাজ নয়।

অরুণ কথা খুঁজে পেল না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

—রাণীমা বলেন, আর বেশি দিন উনি বাঁচবেন না। মৃত্যু নাকি ওর কোমরের নিচের দিকে আশ্রয় করেছে, এবার ক্রমশ ওর ওপর দিকে হাত বাড়াতে চাইছে। ওঁর দৃঢ় ধারণা, মৃত্যু ওঁকে ডাকছে। আর বেশি দিন নয়, এবার সব চুকিয়ে দিতে হবে। ফলে, মৃত্যুর পর ওঁর দেহটা রক্ষা করে রাজাবাবুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার সব ব্যবস্থাই উনি করে যেতে চান। আর সে জন্যই আপনাকে ডাকা। আপনার ওপর ভরসা করতে চান উনি।

অরুণ আবার স্বামী শুদ্ধানন্দের দিকে তাকাল, আচ্ছা একটা কথা, এই যে দেহটা একশ' বছরেরও বেশি এভাবে পড়ে আছে, এর তো এতটুকুও বিকৃতি হয় নি। কি পদ্ধতিতে এটাকে রাখা হয়েছে বলতে পারেন?

রাধা বিচিত্র ভাবে অরুণের দিকে তাকাল।

—না মানে, আমি যেভাবে রাখতে চাই, সেটা অন্যরকম। আমি মনে করি বিজ্ঞানের যুগে আরো সহজ পদ্ধতিতে ডেড বডিকে রাখার ব্যবস্থা করা যায়।

রাধা আবার ম্লান হেসে উঠল, আমরা কিন্তু স্বামী শুদ্ধানন্দকে এখানে অত্যন্ত সাধারণভাবে রেখেছি। দাঁড়ান, কফিনের ঢাকনাটা খুলে ফেলি।

—ঢাকনা খুলবেন! অরুণ অবাক হল।

—ঢাকনা খুললেই আপনি বুঝতে পারবেন। যদি ইচ্ছে করেন, স্বামীজীর গায়ে হাতও বুলিয়ে দেখতে পরেন।

অরুণ কেমন বোকার মতো তাকায়। সত্যি সত্যি ঢাকনাটা খুলে ফেলবে নাকি! একে এই গোপন রহস্যময় ঘর, তায় দরজাটাও বন্ধ রয়েছে। চট করে যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া যাবে তারও উপায় নেই।. তবু পরক্ষণেই অরুণ নিজেকে দৃঢ় করার চেষ্টা করল। এ ব্যাপারে ওর এতটুকু দুর্বলতা দেখান উচিত নয়। তাছাড়া মৃতদেহ

নিয়ে কারবার করতেই ও এসেছে, এত সহজে ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন! বলল, ঢাকনা যে খুলে ফেলবেন, ক্ষতি হবে না?

—এ দেহের কোনদিনই ক্ষতি হওয়ার নয়। রাধা কফিনের এক পাশে চট করে এগিয়ে এসে একটা চাবি ঘুরিয়ে কফিনের লক খুলল। তারপর আশ্চর্য, এতটুকু দ্বিধা না করেই ঢাকনাটা দু'হাতে খুলে ফেলল।

কেমন অস্বস্তি লাগে অরুণের। রাধার কথা অনুযায়ী কফিনের ভিতরে শুয়ে থাকা স্বামীজীকে একটু ছুঁয়ে দেখা যেতে পারে, কিন্তু একশ' বছরের পুরনো মানুষের দেহ, না জানি কেমন বিষাক্ত হয়ে রয়েছে।

অরুণ লক্ষ্য করল, ঢাকনা খুলে ফেলা সত্ত্বেও কোন রকম গন্ধ নেই। ওর মনে হয়েছিল, ঢাকনাটা খুললেই বিশ্রী একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। হয়তো নাকে রুমাল চাপতে হবে, কিন্তু না, সব কিছুই আগের মতো স্বাভাবিক।

রাধা বলল, দেখুন না, গায়ে হাত দিয়ে দেখুন।

অরুণ কৌতুকে আরো একটু এগোল বটে, তবে বলল, দেখার কি আছে, থাক। ঢাকনাটা বন্ধ করে দিন।

—না না, বন্ধ করব কেন! হাত দিন না। হাত দিলেই রহস্যটা আপনি ধরতে পারবেন।

—রহস্য! অরুণ কেমন অবাক হল, কি রহস্য?

—বললাম তো হাত দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

অরুণের এক মুহূর্ত সময় লাগল সিদ্ধান্ত নিতে। তারপর আর সময় নষ্ট না করে স্বামীজীর মুখের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সারা গায়ে একটা বাঘের ছাল বিছানো। গলা থেকে মুখখানা উন্মুক্ত। মুখে এক গাদা দাড়িগোঁফ। মাথা ভর্তি পাটের ফেঁসোর মতো জট পাকানো চুল। চুল দাড়ির ফাঁকে কপাল আর গাল দেখা যাচ্ছে। অরুণ স্বামীজীর কপালের একপাশে আঙ্গুল রাখল। না, যত

হিমশীতল ভাবা গিয়েছিল তা তো নয়। তাছাড়া দেহটা এমন নিরেট হয় নাকি মৃত্যুর পরে!

—কিছু বুঝতে পারছেন? রাধা তখনো কফিনের ডালাটা হাত দিয়ে তুলে রেখেছে।

অরুণ আঙ্গুল সরিয়ে নিয়ে রাধার দিকে তাকাল। এত পুরনো দেহ, অথচ একেবারেই কোন গন্ধ নেই, এ কি করে সম্ভব?

—বুঝতে পারলেন না? ঠিক আছে ওর গালের চামড়ায় হাত দিয়ে দেখুন।

অরুণ আবার হাত বাড়াল। ধীরে ধীরে স্বামীজীর গালের চামড়ায় তিন চারটে আঙ্গুল এক সঙ্গে চেপে ধরল। না, মানুষের চামড়াই যদি হবে তাহলে পাথরের মতো এমন নিরেট লাগবে কেন। হঠাৎই মনে হল, পাথরের মূর্তি নয় তো। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। হাত সরিয়ে নিল অরুণ।

ডালাটা আবার ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল রাধা। তারপর বলল, আসলে আপনি যা ভেবেছেন, তাই-ই।

—আমি কি ভেবেছি? আপনি কি মানুষের মনের কথাও বুঝতে পারেন নাকি! অরুণের গলার আওয়াজ কেমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে হয়ে উঠল।

রাধা হাসল, বললাম তো আসলে আপনি যা সন্দেহ করছেন, সেটাই ঠিক।

—কি সন্দেহ করছি?

রাধা আবার একটু হাসল, স্বামীজীর আসল দেহটাই যদি হত, তাহলে এত সহজে আপনি ওর গায়ে ছুঁয়ে দেখতে পারতেন না। স্বামীজীর এটা একটা নকল মূর্তি।

—নকল। অরুণ কেমন বোকার মতো তাকিয়ে থাকে মূর্তিটার দিকে। অথচ অবিকল একটা মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। দূর থেকে চামড়ার সূক্ষ্ম ভাঁজও দেখা যাচ্ছে।

—তা অবশ্য ঠিক, নিখুঁতভাবে বানানো হয়েছে। শুনেছি, জাপান থেকে একজন শিল্পী এনে মূর্তিটা বানানো হয়েছিল। তাছাড়া আসল রক্ত-মাংসের দেহ হলে সামান্য একটা কাচের কফিনে এতকাল ধরে কী রাখা সম্ভব! আপনিই বলুন না?

অরুণ আবার মূর্তিটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তবে কি পাথরের তৈরি?

—না, পাথর নয়। চায়না ক্লে।

অরুণের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। বলল, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি বোকা বনে গেছি। বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি, এটা প্রতিমূর্তি। আসল নয়।

রাধা বলল, স্বামীজীর দেহ কিন্তু অবিকল এরকমই ছিল। কোথাও কোন গড়মিল কেউ খুঁজে পাবে না। ফলে, ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।

অরুণ আবার স্বামীজীর মুখের দিকে তাকায়। যেন সত্যি সত্যি উনি কফিনের ভিতর চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়েই আছেন। ঘরে একটু গণ্ডগোল হলেই যেন ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে।

রাধা হাসল, চলুন, অন্য ঘরগুলো দেখতে হবে, আমরা বেরুই।

আবার মোমবাতির স্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে এল রাধা। টর্চটা তুলে নিয়ে মোমবাতিটাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরে অন্ধকার আবার লাফিয়ে পড়ল। নিরেট অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অন্ধকারকে চিরে টর্চ জ্বালল রাধা। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে এল। লক খুলল।

অরুণ বেরিয়ে এল বাইরে। রাধাও। সেই প্যাসেজটা আবার চোখে পড়ল, কেমন থমথমে হয়ে আছে।

রাধা বলল, ও-পাশের ঘরে দেববর্মনদের বেশ কিছু প্রাচীন পুঁথিপত্র রয়েছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক চিহ্নও।

অরুণ তাকাল। প্যাসেজের দু'পাশে পর পর কয়েকটা ঘর। জিজ্ঞেস করল, ঐতিহাসিক চিহ্ন বলতে কি বলছেন?

—দেববর্মনদের বহুকালের পুরনো পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র কার্পেট এই সব আর কি। আর ও-পাশের ওই ঘরে রয়েছে দেব বর্মনদের বহু প্রাচীন কয়েকটা তৈল চিত্র। তাছাড়া কোন্ কোন্ রাজা কি কি শৌর্য-বীর্যের কাজর করেছেন তার গ্রন্থপঞ্জী।

অরুণ তেমন উৎসাহ দেখাল না, বলল, আর ও ঘর দুটোয় ?

রাধা বলল, একটাতে নীল টেম্পলের মডেল, আর—

—নীল টেম্পল। মানে কার্শিয়ংয়ে, যেখানে দনুজদলন দেববর্মন থাকেন ? মানে রাজাবাবু যেখানে আছেন ?

—হ্যাঁ, সেই নীল টেম্পল।

—তাহলে, চলুন ওটাই দেখব। অরুণ আগ্রহ দেখাল।

রাধা বলল, বেশ চলুন। দরজার কাছে এগিয়ে এল রাধা, লক খুলল, আসুন।

—এ ঘরের ভেতরেও তেমনি অন্ধকার। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল রাধা।

তারপর টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়ালে সুইচ খুঁজতে খুঁজতে বলল, এ ঘরে ইলেকট্রিক আলোর বন্দোবস্ত আছে। দাঁড়ান, জ্বেলে নিই।

সুইচ টিপতেই হালকা নীল রংয়ের একটা বালব জ্বলে উঠল। আলোর তীব্রতা এমন কিছু বেশি না থাকলেও নিমেষেই ঘরের সমস্ত কিছু চোখের ওপর ভেসে উঠল ওদের। অরুণ দেখল, ঘরের ঠিক মাঝখানে বিশাল ভারি কাঠের কোমর উঁচু একটা টেবিল। সেই টেবিলে পাহাড়ী অঞ্চলের একটা ডামি। পাথর, পাহাড়, গাছপালা, পাহাড়ের গায় রাস্তা সবই দেখা যাচ্ছে।

অরুণ দরজা ছেড়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। আবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আপনি আপনি বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো লকই হয়ে গেল। তা হোক, অরুণ এবার আর চমকে উঠল না। ঘরগুলোর দরজায় অটো-লক রয়েছে।

রাধা বলল, এই যে পাহাড়ের মাথা ভাঙ্গা অংশটা দেখছেন, এটাই নীল টেম্পল।

টেম্পল। কোথায় টেম্পল? অরুণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে।

রাধা বলল, হয়তো এককালে এখানে কোন বৌদ্ধ বিহার-টিহার ছিল এখন আর নেই। হয়তো সেই বৌদ্ধ বিহার থেকেই এর নাম নীল টেম্পল হয়েছে।

—এদিকে দেখুন, রাধা আর একপাশে আঙ্গুল তুলে দেখাল, এই যে ছোট ছোট কাঠের বাড়িগুলি দেখছেন, এটা হল কার্শিয়ং।

অরুণ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল, ডামিটা এত নিখুঁত যে কার্শিয়ংয়ের ওপর দিয়ে যে রেল লাইন গেছে, তাও দেখা যাচ্ছে। ওটা কি? প্রশ্ন করে অরুণ।

রাধা বলল, চিনতে পারছেন না? দার্জিলিং যাননি কোন দিন?

অরুণ বলল, অনেক দিন আগে একবার গিয়েছিলাম।

রাধা বলল, এটা হচ্ছে কালিংপং। তা, নীল টেম্পলে যেতে হলে কার্শিয়ং থেকে যাওয়া ভালো। পাহাড়ের গা দিয়ে এই যে রাস্তাটা নেমে গেছে এটাই নীল টেম্পলের রাস্তা। এই রাস্তা ধরে এগোলে প্রথমে পড়বে নীলঝোরা।

পাহাড়ের গায় ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। অরুণ তাকিয়ে রইল।

—এটাই নীলঝোরার বাংলো। শীতের সময় এখানে প্রচুর বরফ পড়ে। তখন এদিককার রাস্তাও খুব খারাপ হয়ে যায়।

কার্শিয়ং থেকে নীলঝোরা অবধি রাস্তাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল অরুণ। কত চড়াই উতরাই। কখনো বা পাহাড়ের গায় সাপের মতো পাক খেয়ে খেয়ে উঠেছে।

রাধা বলল, নীল টেম্পলে এই নীলঝোরা হয়েই যেতে হয়। কিন্তু বাইরের টুরিস্টরা এই নীলঝোরা অবধিই এসে থাকেন। আর এগোন না। এখানে দু'একদিন কাটিয়ে আবার ফিরে যান।

অরুণ বাংলোটাকে বুঝবার চেষ্টা করছিল। পাহাড়ের গায় খানিকটা সমতল ঘাসের জমি। তাতে ছোট্ট একটা কাঠের বাংলো মতোই দেখাচ্ছে।

—কি দেখার আছে এখানে? প্রশ্ন করে অরুণ।

রাধা বাংলোর পেছন দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাল, এই যে বরফ ঢাকা চূড়োটা দেখছেন, এটাই কাঞ্চনজঙ্ঘা। নীলঝোরা থেকে কাঞ্চন-জঙ্ঘার সূর্যোদয় দেখার মতো।

অরুণের মাথায় ঘুরছিল নীল টেম্পল, বলল, টুরিস্টরা এত দূর আসেন, নীল টেম্পল দেখতে যান না? রাধা হাসে, নীল বাংলো থেকে টেম্পল দেড়-দু' কিলোমিটার পথ, কিন্তু খুব দুর্গম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হয়। মাঝখানে একটা পাহাড়ী নালার মতো আছে, সেটা ডিঙোন বেশ মুস্কিল। জলের ভীষণ কারেণ্ট।

অরুণ নীল টেম্পলটাকে বুঝবার চেষ্টা করল, কোন বাড়িঘর বা থাকার মতো জায়গা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটা পাহাড়ের মাথাভাঙা ঢিবির মতো পড়ে আছে। রাজাবাবু এখানে কোথায় থাকেন?

রাধা বলল, নীল টেম্পলের মজাই এই, বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিন্তু এর ভেতরে বেশ কয়েকটা সুড়ঙ্গ আছে। তাছাড়া রাজাবাবুর থাকবার মতো ঘরটরও আছে। বড় রাণীমাকে ওখানেই একটা হিমশীতল গুহার মধ্যে রেখে দেওয়া আছে।

অরুণ শুধাল, নীল টেম্পলের ভেতরের কোন ম্যাপট্যাপ নেই আপনাদের কাছে?

—ম্যাপ! রাধা অরুণের দিকে তাকায়, যা আছে তা এটুকুই। ম্যাপ রাখার কোন প্রয়োজন হয়নি কোনদিন।

অরুণ কেমন একটু হতাশ হল। সুভদ্রাদবীর রহস্য বুঝতে হলে ওকে এই নীল টেম্পলের উদ্দেশ্যেই ছুটতে হবে সন্দেহ নেই। আর তা যদি হয়, এই টেম্পলের সুড়ঙ্গগুলি একটু জানা থাকলে

নিশ্চয়ই ওর সুবিধে হত। আসলে যতদিন না রাজাবাবুর মুখোমুখি হওয়া যাচ্ছে, ততদিন যেন কোন রহস্যেরই সমাধান হবে না, এই রকমই মনে হতে থাকে অরুণের।

—কি ভাবছেন? প্রশ্ন করে রাধা।

অরুণ একটু চমকে উঠেছিল, না, তেমন কিছু না। আচ্ছা, নীল টেম্পলে একবার ঘুরে আসা যায় না? প্রশ্ন করে সরাসরি রাধার দিকে তাকায় অরুণ।

—ওখানে বাইরের লোক কেউ যান, রাজাবাবু পছন্দ করেন না।

অরুণ আবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে, কেন?

—রাজাবাবু নির্জনতার জন্যই ও জায়গাটা বেছে নিয়েছেন। নইলে উনি কলকাতাতেও থাকতে পারতেন।

—আমি যদি যাই, নিশ্চয়ই রাজাবাবুর নির্জনতা ভাঙব না। আমি কেবল বড় রাণীমার দেহটাকে একটু চোখের দেখা দেখেই ফিরে আসব। রাজাবাবুকে রাজি করানো যায় না?

রাধা বলল, রাণীমাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। আমি যতদূর জানি, রাজাবাবু বাইরের লোক একদম পছন্দ করেন না। বলতে বলতে রাধা আবার দেয়ালের সুইচের কাছে এগিয়ে এসেছিল, বলল, চলুন রাত হয়ে যাচ্ছে, আমরা বেরুই এবার।

অরুণ ঘরের স্বল্প আলোয় হাতঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়িতে আটটা চল্লিশ। ওর পক্ষে রাতটা এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু এ বাড়ির ক্ষেত্রে হয়তো বেশিই হয়ে যাচ্ছে।

রাধা ততক্ষণে সুইচ অফ করে দিয়ে আবার টর্চ জ্বালল। তারপর এগিয়ে এসে ঘরের দরজা খুলল। আসুন! বেরিয়ে এল বাইরে।

প্যাসেজে এসে রাধা বলল, চলুন, অন্য একদিন না হয় বাকি ঘরগুলো দেখবেন। রাণীমা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

অরুণ আপত্তি করল না, তাই চলুন।

রাধার পেছন পেছন আবার এগোতে থাকে ও। সামনেই ধাপ

ধাপ ওপরে উঠার সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ধরেই ওরা নেমেছিল এই প্যাসেজে। সিঁড়ির ধাপ ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে অরুণের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল নীল টেম্পল। যেভাবেই হোক ওই টেম্পলে একবার ওকে ঢুকতেই হবে। যেভাবেই হোক রাজাবাবু লোকটাকে ওর দেখতেই হবে। সুভদ্রাদেবীর কাছে প্রস্তাবটা একবার রেখে দেখতে আপত্তি কি !

সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে এল ওরা। সামনেই সেই দরজার পর্দা ঝুলছে। রাধা পর্দা সরিয়ে বলল, আসুন।

ঘরে ঢুকতেই অরুণের বুক কেঁপে উঠল, একসঙ্গে তিন-চারটে কুকুর লাফিয়ে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ায় ও। কুকুর তো নয়, যেন মৃত্যুদূত।

রাধাই অবস্থাটা সামাল দিল। কুকুরগুলিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ধমকে সরিয়ে দিল।

—আসুন, ও ঘরে রাণীমা আছেন। দেখা করবেন চলুন।

আবার সাবধানে এগোতে থাকে অরুণ। সামনেই আর একটা পর্দা। এ পর্দাটা পার হলেই বার্মিজ ভিলার প্রথম ঘর। বাইরে থেকে কেউ এলে এ ঘরেই প্রথম ঢুকতে হয়।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। আর এ সময় রাণীমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাকিয়ে দেখল, সেই সাইকেল চেয়ার। রাণীমা ধীর-স্থিরভাবে বসে আছেন। পরনে সেই আগের দিনের মতই সাদা জমিনের মামুলি একটা শাড়ি।

—বসুন ! রাণীমার চোখে ম্লান একটু হাসি।

অরুণ সোফা চেয়ারের কাছাকাছি এগিয়ে এল। তারপর সঙ্কোচে বসে পড়ল। উপরের ঝাড় লণ্ঠন থেকে আলো ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। ওপাশে সেই দেওয়াল ঘড়িটা টিকটিক করে শব্দ করছে।

রাণীমা সাইকেল চেয়ারের হাতল ঘুরিয়ে আরো একটু এগোলেন, তারপর নরম গলায় প্রশ্ন করলেন, নিচের ঘরগুলো দেখলেন ?

রাণীমার চোখে আজও সেই রূপোলি ফ্রেমের চশমা।

অরুণ উৎসাহে বলল, স্বামী শুদ্ধানন্দকে এমনভাবে রেখেছেন, প্রথম দেখায় আমি চমকেই উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, উনি ঘুমুচ্ছেন। পরে অবশ্য রাধাদেবীই আমার ভুলে ভেঙে দেন।

রাণীমা বললেন, স্বামী শুদ্ধানন্দ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। উনি মৃত মানুষের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন।

—কি রকম? অরুণ তাকিয়ে থাকে।

ওদিকে কুকুরগুলি ততক্ষণে রাণীমার চারপাশে ঘিরে বসেছে। যেন রাণীমার কথা ওরাও আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

সুভদ্রাদেবী বললেন, প্রকৃত সাধক বলতে যা বোঝায় উনি ছিলেন তাই। আমাদের জগৎতাড়িণী দেবীকে দেখেছেন, স্বামী শুদ্ধানন্দ ওর সঙ্গে শিশুর মতো মিশে যেতেন। হাসিকান্না খেলাধুলায় মেতে উঠতেন

—মৃত মানুষের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতেন কি রকম? মৃত মানুষ আবার বেঁচে উঠত?

সুভদ্রাদেবী স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন, আমি অবশ্য এ সংসারে যখন আসি তার বহু আগেই স্বামীজী দেহরক্ষা করেছেন। ফলে, কোনদিনই ওর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় নি আমার। তবে শুনেছি, উনি অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটাতে পারতেন। আমার শ্বশুরমশাই অর্থাৎ বিশ্বদেব দেববর্মনকে উনি মৃত্যুর পর আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। শ্বশুরমশাইয়ের যখন বছর কুড়ি বয়স তখন তিনি একবার শিকারে বেরিয়ে স্বর্পাঘাতে প্রাণ হারান। বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দই তখন তিনদিন তিন রাত কঠোর তপস্যার পর আবার তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। এরপর আমার শ্বশুরমশাই নব্বই বছর অবধি সংসার করে গেছেন।

অরুণ মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিন্তু খুব একটা আশ্চর্য হল না। সাপে কাটা মড়াকে বাঁচিয়ে তোলার কাহিনী একটু খুঁজে বেড়ালেই

হয়তো আরো অনেক শোনা যেতে পারে। বলল, জগৎতাড়িণী মূর্তির সামনে আগে নরবলি হত, সেও কি স্বামী শুদ্ধানন্দেরই আমলে?

সুভদ্রাদেবী প্রশ্নটাকে বিন্দুমাত্র এড়াবার চেষ্টা করলেন না, বললেন, যতদিন নরবলি চালু ছিল, ততদিন এ সংসারে সুদিন গেছে নরবলি বন্ধ হওয়ার পরই কিন্তু দুর্দিন শুরু হয়েছে।

—নরবলি দিলে সংসারের মঙ্গল হয়, একথা আপনি বিশ্বাস করেন?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আলাদা, তবে এ সংসারে যা ঘটেছে তাই বললাম।

অরুণ চুপ করে গেল।

সুভদ্রাদেবীই আবাব বললেন, সেকথা থাক. পরে ও-সব অনেক কথা আপনাক খুলে বলতে পারব আগে দু'চারটে দরকারী কথা সেরে নিই।

—বলুন। অরুণ ঝুঁকে বসে

—আপনি তাহলে দায়িত্ব নিতে রাজি?

অরুণ মাথা নাড়ল, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আপনি যদি কোন লেখাপড়ির মধ্যে আসতে চান, আমি তাতেও রাজি

—একটা লেখাপড়ি তো করতে হবেই কিন্তু তার আগে আপনাকে কিছুটা ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াতে চাই।

—ঝামেলা! অরুণ বিস্মিত চোখে তাকায়

—মানে, কিছু অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে হয়তো আপনাকে পড়তে হতে পারে, তবু –

—খুলে বলুন না?

সুভদ্রাদেবী আরো একটু এগিয়ে এলেন, আপনাকে একবার নীল টেম্পল থেকে ঘুরে আসতে হবে।

অরুণ যেন হাতে স্বর্গ পেল। এরকম একটা প্রস্তাব অরুণই রাখবে কিনা ভাবছিল। বলল, এ আর কী কঠিন কাজ। নিশ্চয়ই যাবো, দরকার হলে দু'একদিনের মধ্যেই যেতে পারি।

—কাজটা যত সহজ ভাবছেন, তা নাও হতে পারে। আপনাদের রাজাবাবু ওই যক্ষপুরীতে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেবেন বলে মনে হয় না।

—আপনার কাছ থেকে আসছি বললেও ঢুকতে দেবেন না?

—না দেবারই কথা। তা ঢুকতে দিক আর নাই দিক, রাজাবাবুর সঙ্গে আপনাকে একবার দেখা করতেই হবে। পারবেন?

—পারব। অরুণ উত্তর করল।

—রাজাবাবুকে শুধু একটা কথাই জানাতে হবে। আমাকে তো আপনি দেখছেন, বলবেন, আমাকে যেন উনি ক্ষমা করেন। আমার মৃত্যুর পর অন্তত টেম্পলের গুহায় যেন বড়র পাশাপাশি উনি আমাকে আশ্রয় দেন।

অরুণ কথা খুঁজে পেল না। রাণীমাকে বোঝা যাচ্ছিল না। স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার এতই যদি আকুতি, তাহলে এটুকুর জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক ডাকার কি দরকার ছিল। বলল, এই সামান্য কটি কথা তো আপনি চিঠি লিখেও জানাতে পারতেন।

—জানিয়েছিলাম, ফল হয় নি। চিঠির উত্তর পর্যন্ত আসে নি। শেষপর্যন্ত তারাপদকেও পাঠিয়েছিলাম, তাতেও কাজ হয় নি। তারাপদর কথা বিশ্বাসই করেন নি।

—আমার কথা কি তাহলে বিশ্বাস করবেন?

—না করলেও কিছু আসবে যাবে না। আপনি আমার দেহের দায়িত্ব নিতে চাইছেন এই কথাটা শুধু ওঁকে বুঝিয়ে আসবেন। দেহরক্ষা করার ব্যাপারে উনি যদি আপনাকে কিছু বলতে চান, শুনে আসবেন। ব্যাস।

সুভদ্রাদেবী চশমা খুলে আঁচলে মুখ মুছলেন, আবার চশমাটা পরে নিয়ে বললেন, বলবেন, ওঁর ইচ্ছে মতোই দেহটা কোনদিন নষ্ট করা হবে না, উনি যদি কখনো নিজের কাছে নিয়ে যেতে চান, নিয়েও যেতে পারেন।

অরুণ বলল, ঠিক আছে, আমি সাধ্যমতো ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করব।

—চেষ্টা করবেন বড়কে একবার দেখে আসার। মৃত্যুর পর একটা মানুষ কত নিশ্চিন্তে ঘুমোয় সেটাও দেখে রাখার মতো। অবশ্য সবই হবে রাজাবাবু যদি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করেন তাহলেই।

অরুণ হাসল, আমি তো জেনেশুনেই যাব, খারাপ ব্যবহারে এমন কিছু অসুবিধা হবে না। আচ্ছা রাজাবাবুর একটা ছবি নেই?

সুভদ্রাদেবী সাইকেল চেয়ারের হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেয়ারটাকে প্রায় উল্টোমুখো করে ফেললেন। কুকুরগুলি আবার ছটফট করে রাণীমাকে ঘিরে ধরল। রাণীমা আঙুল তুলে ধমক দিতেই আবার ও-গুলি মাটিতে ঘাড় গুঁজে বসে পড়ল। আশ্চর্য পোষমানা কুকুর।

—এদিকে এই যে ছবিটা দেখছেন, এপাশের এই ছবিটাই উনি।

পরপর তিনটে অয়েল পেন্টিং দেখা যাচ্ছিল দামী কাজ করা কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো। অরুণ দেখল, মুসলমান ফকিরের মতো ঢিলেঢালা পোশাক পরা দীর্ঘকায় এক পুরুষ। পায়ে বুট, মাথায় বাদিজ টুপি। ঘরের ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় চোখমুখের অভিব্যক্তি খুব স্পষ্ট ধরা না পড়লেও মুখের ভাষায় বেশ কাঠিন্য লুকিয়ে আছে বলে মনে হল অরুণের।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরুণ। গতকাল যখন এ ঘরে এসে বসেছিল ও, তখন কিন্তু ইনিই যে সেই দনুজদলন দেববর্মন একথা ওর মাথাতেই আসে নি। জিজ্ঞেস করেও নেওয়া হয় নি।

—আর এই পাশের ছবিটা হচ্ছে আমার দিদির।

– দিদি মানে বড় রাণীমা?

—হ্যাঁ, ইনিই এখন নীল টেম্পলের গুহায় চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন।

অরুণ দেখল, ভদ্রমহিলার পরনের শাড়িটার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য

আছে। দু'হাতে, গলায়, কানে, খোঁপায় অজস্র গহনা। চোখের দৃষ্টি কেমন মায়া মাখানো, সজল।

তৃতীয় ছবিটার দিকে চোখ পড়ল অরুণের। ওটা যে সুভদ্রা দেবীর বুঝতে একটু সময় লাগে। অরুণ জিজ্ঞেস করল, কত বছর আগেকার ছবি এ-গুলি? আপনাকে দেখে কিন্তু চিনতে কষ্ট হয়।

সুভদ্রাদেবী ম্লান একটু হাসলেন, আমিই আমাকে চিনতে পারি না। কোন এক সময় আমি নাকি এরকম ছিলাম।

অরুণ ছবির সুভদ্রাদেবীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। সুভদ্রাদেবীরও সারা গায়ে কত গয়না! পরনে কি বক- ঝলমলে শাড়ি। অথচ আজকের সুভদ্রাদেবী কত সাধারণ।

—তাহলে কবে যাচ্ছেন আপনি?

হঠাৎই আবার চমকে উঠল অরুণ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দু'একদিনের মধ্যেই। আপনাকে জানাব।

—ঠিক আছে। আপনি ফিরে আসার পরই লেখাপড হবে। টাকা-পয়সা সম্পর্কেও কথা হবে।

অরুণ মাথা নাড়ল, ঠিক আছে, তাই হবে।

সুভদ্রাদেবী আবার চেয়ারের হাতল ঘুরিয়ে নিলেন. প্রায় দরজার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন, রাধা।

কুকুরগুলি ছুটে অন্দরে ঢুকে পডল, আবার লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে অরুণকে ঘিরে ধরল। অরুণ কাঠ হয়ে গেল

রাধা ঘরে ঢুকেই কুকুরগুলোকে আবার ধমকে উঠল, আয়. আয় বলছি এ কী অভদ্রতা এই—এই—

রাণীমা শুধোলেন, তারাপদ কোথায়? তারাপদকে বলো, অরুণবাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। অনেক রাত হয়ে গেছে

অরুণ কথা বলল না। কুকুরগুলো না সরা অবধি ওর কথা বলার উপায়ও নেই।

রাধা আবার কুকুরগুলোকে তাড়া দিয়ে রাণীমার সঙ্গে ভেতর

ঘরে পাঠিয়ে দিল। তারপর অরুণের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আসুন। ড্রাইভার গাড়ি বার করে রেখেছে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ঘর ছেড়ে সেই চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা। তারাপদবাবু সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অরুণকে দেখে ডাকলেন, আসুন।

তারপর ওরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বাসিক্ত ভিলা থেকে। সদর পেরিয়ে বাইরে বেরুতেই দেখল, একটা জাপানী টয়েটো।

তারাপদবাবু বললেন, উঠুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি রাত হয়ে গেছে।

অরুণ গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, কলকাতায় দশটা সাড়ে দশটা এমন কিছু রাত নয়। হাসল, কোথাও কোথাও এসময় থেকেই রাত শুরু হয় জানেন তো?

ততক্ষণে তারাপদবাবুও গাড়িতে উঠে বসেছেন চলুন ড্রাইভারজী।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অরুণই আবার প্রশ্ন করল, একটা ব্যাপার কিন্তু এখনো পরিষ্কার হল না, রাণীমা যে ঠিক কি চাইছেন এখনো তা বুঝতে পারলাম না। বরং সব কেমন গোলমেলে লাগছে

—সে কী মশাই, তারাপদবাবু অরুণের দিকে তাকালেন, আজ তো অনেক খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে আপনাদের। নীলঝোরা, নীল টেম্পল আরো কত কী।

অরুণ হাসল, তা ঠিক, জগৎতাড়িণী মাতাকেও দেখলাম স্বামী শুদ্ধানন্দকেও চাক্ষুস করলাম।

—এরপর নীল টেম্পলের উদ্দেশ্যেও ছুটে যাবেন নিশ্চয়ই?

অরুণের কেমন খটকা লাগল, কেন বলুন তো?

—কেন কি? কবে যাচ্ছেন? তারাপদবাবু তেমনি স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন অরুণের দিকে।

অরুণ বলল, দু'একদিনের মধ্যেই যেতে পারি। কিন্তু নীল টেম্পল সম্পর্কে যা বুঝেছি তাতে খুব একটা ভরসা পাচ্ছি না। রাজাবাবু সম্পর্কে একটু খোলসা করে বলুন না, আপনি তো কিছুদিন আগেই একবার ঘুরে এসেছেন।

তারাপদবাবুর মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অরুণের চোখ এড়াল না।

—বলুন না মশাই, আমি তো বাইরের লোক, হঠাৎ গিয়ে ঝামেলায় পড়ব, সেটা কি ভালো ?

গাড়িটা ডোভার লেনের প্রায় কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল, রাস্তাঘাট সত্যি সত্যি আজ বড় নির্জন।

তারাপদবাবু বললেন, বলতে পারি একটা শর্তে।

অরুণ আরো আগ্রহে তাকাল, শর্ত, কি শর্ত ?

– কথাটা যদি প্রকাশ না করেন, তাহলে বলতে পারি।

অরুণ প্রতিজ্ঞা করল, কথা দিচ্ছি, আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। আমি কখনো কথার খেলাপ করি না।

তারাপদবাবু আবার একবার অরুণের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, রাণীমার কাছে আপনি হচ্ছেন তৃতীয় ব্যক্তি।

—তৃতীয় ব্যক্তি ! মানে ?

—মানে, আপনার আগে আরো দু'জনের সঙ্গে রাণীমা কথা বলেছিলেন। শেষপর্যন্ত সেই দু'জন আপনারই মতো নীল টেম্পল দেখতে কার্শিয়াংয়ে গিয়েছিলেন।

—তাই বুঝি ! তারপর ? অরুণের বিস্ময় কাটছিল না।

—তাঁরা আজও ফেরেন নি।

—একসঙ্গে গিয়েছিলেন ?

—না না, একসঙ্গে নয়। প্রথম জন গিয়েছিলেন মাস ছয়েক আগে, আজও ফিরে আসেন নি। দ্বিতীয় জন, তা মাস দুই তো হবেই,

তিনিও ফেরেন নি। এবার আপনি যাবেন, আপনি হবেন তৃতীয় ব্যক্তি।

গাড়িটা অরুণের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। অরুণ ভুলে গেল ওকে নামতে হবে। বলল, ফেরেন নি মানে?

—হয়তো তাঁরা আর যোগাযোগ করতে সাহস পান নি।

—তার মানে?

—তার আর মানে নেই মশাই আপনি যান না, গেলেই তো বুঝতে পারবেন।

তারাপদবাবু ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছেন অরুণের নামবার জন্য। ড্রাইভার লোকটা কেমন নির্বিকার। যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে সে স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে বসে আছে।

অরুণ গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হল, তার মানে, আমার যাওয়া ঠিক হবে না বলছেন?

—না না, সে কথা বলব কেন! নীল টেম্পলে যাওয়ার পর সবাই কেমন হারিয়ে যান, অবশ্য আপনি একটু অন্যরকম, আপনি নিশ্চয়ই যাবেন, চলে যান।

—আগে যে দু'জন গিয়েছিলেন, তাঁদের কোন খোঁজ করেন নি আপনারা? অরুণ সরাসরি প্রশ্ন করল।

তারাপদবাবু বললেন, খোঁজ তো আমাদের করার কথা নয়, কথা ছিল ওরাই ফিরে এসে রাণীমার সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর কাগজপত্র সইসাবুদ করে ব্যাপারটাকে পাকা করে ফেলবেন। হয়তো ওরা নীল টেম্পল থেকে ফিরে এসে আর আগ্রহ দেখাতে চান নি

—কেন?

—কেন কি করে বলি বলুন দেখি?

অরুণের কাছে ব্যাপারটা কেমন দুর্বোধ্য লাগতে থাকে. তারাপদবাবু ওর যাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা যে নিরুৎসাহ দেখাচ্ছেন,

সন্দেহ নেই। তাছাড়া আগের দু'জনের ব্যাপারে রাণীমা ঘুণাক্ষরেও বললেন না কেন, তবে কি নীল টেম্পলের পেছনে অন্য কোন জটিল রহস্য রয়ে গেছে !

গাড়িটা স্টার্ট নিতে যাচ্ছিল অরুণ হাত তুলে থামাল। একটু দাঁড়ান, এক মিনিট। তারাপদবাবুর দিকে তাকিয়ে অরুণ আবার প্রশ্ন করল, যে দু'জনকে আগে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের নাম-ঠিকানা দিতে পারেন ?

—কেন পারব না ! তবে ওঁরা কেউই কলকাতার বাসিন্দা নন। কলকাতার বাসিন্দা হলে বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়া যেত।

—কলকাতার নয়, তবে কোথাকার ?

—একজন থাকেন কটকে, আর একজন লখনউয়ের ঠিকানা দিয়েছিলেন। দু'জনের কাছেই আমরা চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু কেউ কোন জবাব দেন নি। এর ফলে আমরাও আর আগ্রহ দেখাই নি

—কি নাম বলবেন ?

তারাপদবাবু বললেন কটকে যিনি থাকেন তিনি একজন ওড়িশ্যাবাসী মিস্টার পট্টনায়ক।

—পট্টনায়ক তো পদবী, নাম ?

তারাপদবাবু বললেন, উমেশ পট্টনায়ক।

—উমেশ পট্টনায়ক ! চমকে উঠল অরুণ, পরলোকতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন যে ভদ্রলোক তিনি ?

—আপনি চেনেন নাকি ? তারাপদবাবু এবার বিস্ময়ে তাকালেন।

—না তেমনভাবে চিনি না। তবে ঘটনাচক্রে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ঠিক আছে, আর সেই লখনউয়ের ভদ্রলোকের নাম ?

· ঘটনাচক্রে বলতে ? পাল্টা প্রশ্ন করলেন তারাপদবাবু।

অরুণ বলল, ঘটনাচক্র ছাড়া কি আর। পুরী থেকে ফেরার সময় একই ট্রেনে একই কপার্টমেণ্টে উঠেছিলাম।

—পরলোক নিয়ে গবেষণা করেন, অথচ আপনি আগ্রহ দেখান নি?

—পরে আর যোগাযোগ হয়নি। মাঝে মাঝে ভেবেছি, ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করব, তা আর হয়ে ওঠে নি। সে যাক, লখনউয়ের ভদ্রলোক কি করেন?

তারাপদবাবু বললেন, উনিও প্ল্যানচেট, হিপনোটিজম, মেসম্যারিজম নিয়ে অনেক বইটই লিখেছেন। তাকেও চেনেন নাকি?

অরুণ মৃদু হাসল, নাম কি?

তারাপদবাবু বললেন, টি এন মাধবায়ন। সাউথ ইণ্ডিয়ান। আধো আধো বাংলা বলতে পারেন। এর আগে বহুদিন নাকি কলকাতায় কাটিয়ে গেছেন, এখন লখনউয়ে থাকেন।

অরুণ চিনতে পারল না। বইটই থাকতে পারে, পৃথিবীতে ও-রকম কত গ্রন্থকারইতো রয়ে গেছে, সবার নাম কেউ মনে রাখতে পারে না। বলল, না, নাম শুনি নি।

গাড়িটা আবার স্টার্ট নিল। রাত একটু বেশিই হয়ে গেছে। অরুণ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে, আপনি ও দু'জনের খবর দিয়ে ভালই করলেন। ধন্যবাদ।

তারাপদবাবু গাড়ির দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন, আমার অনুরোধ, এ-সব কথা রাণীমা আপনাকে বলেন নি, ফলে—

—না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তারাপদবাবু এবার বিদায় জানালেন। গাড়িটা হুঁস করে ছুটতে শুরু করে দিল। অরুণ আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উঠে এল নিজের ফ্ল্যাটে।

রঘু এতক্ষণ যে অরুণের জন্য ঘরবার করেছে বেশ বোঝা যায়। অরুণ ফ্ল্যাটে ঢুকে বাইরের দরজা বন্ধ করতে করতে হাসল, ভাবছিলি দাদাবাবু বুঝি নিখোঁজ হয়ে গেছে তাই না?

রঘু কাঁধ ঝাঁকিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

—কাল খুব ভোরে বেরুব, ডেকে দিস রঘুনন্দন।

রঘু আবার ফিরে এল, ব্রতীশদা এতক্ষণ বসে বসে এইমাত্র চলে গেলেন। বলে গেছেন, আপনি এলেই যেন ফোন করি।

—ফোন। কোথায় ফোন করবি? ব্রতীশের বাড়িতে ফোন নেই, তবে কি ব্রতীশ এখনো অফিসে?

রঘু বলল, একটা কাগজে কি লিখে দিয়ে গেছেন। এই দেখুন।

অরুণ সাগ্রহে কাগজটা তুলে নিল। হ্যাঁ, ওর অফিসেরই নম্বর। এত রাতে এখনো ও অফিসে, আশ্চর্য হল অরুণ। তারপর আর কথা না বাড়িয়ে ডায়াল ঘোরাতে শুরু করল।

—হ্যালো। হুঁ, ব্রতীশবাবুকে চাইছিলাম।

ওপাশ থেকে ব্রতীশেরই গলা, কি ব্যাপার এখন ফিরলি? এত রাত হল?

অরুণ বলল, রহস্য জমেছে। তুই কাল সকালেই একবার চলে আয়। ভেবেছিলাম, খুব ভোরে তোর ওখানে আমিই যাব কিন্তু তুই এলেই ভাল হয়। এখানে নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।

—ঠিক আছে আসব। কিন্তু হয়েছে কি? এত রাত হল কেন?

—তুই আয় না, সব জানতে পারবি। শুধু এটুকু বলে রাখি, দু'এক-দিনের মধ্যেই আমাকে কার্শিয়ংয়ের দিকে এগোতে হবে। রহস্য এখন বার্মিজ ভিলা থেকে সরে নীল টেম্পলে গিয়ে জমা হয়েছে।

—কি ধোঁয়াটে করে দিচ্ছিস সব। নীল টেম্পল আবার কি? ওপাশ থেকে উৎকণ্ঠা।

অরুণ হাসে, চলে আয়, সব বলব। টেলিফোনে অত কথা হয় না।

—ঠিক আছে। ব্রতীশের গলা কেমন মিয়োন মনে হল।

অরুণ বলল, গুড নাইট। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখল।

পর দিন সকালে যথাসময়েই ব্রতীশ এসে হাজির। অরুণ গত রাতের ঘটনা গরগর করে বলে গেল ব্রতীশকে। অরুণের আগেও যে দু'জন ও বাড়িতে টোপ ফেলেছিল, তাও বলল।

রঘু চা নিয়ে এল। ব্রতীশ বলল, তার মানে নীলঝোরা বা টেম্পলে যাওয়াটা প্রায় পাকা করে এসেছিস?

—দু'এক দিনের মধ্যেই যাব বলে এসেছি।

—কটকের সেই পট্টনায়কের একবার খোঁজ নিলে হত না?

অরুণ চায়ের কাপে সিপ করতে করতে বলল, মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে। সোজা নীল টেম্পলে গিয়ে দনুজদলনের মুখোমুখি হওয়াই ভাল। কী এমন ব্যাপার থাকতে পারে যাতে পট্টনায়ক বা মাধবায়ন পিছিয়ে গেল, তা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে।

ব্রতীশ একটু ভাবল, ঠিক আছে তাহলে কালই যাই চল। আমি টিকিট কেটে রাখব দু'জনের।

অরুণ অবাক হল, তুই যাবি?

—না যেয়ে আর উপায় আছে! তোকে অত দূরে একা এক ছাড়া যায় কখনো! যা আনাড়ি তুই।

—কিন্তু কি বলে পরিচয় দেব তোর? অরুণ ভ্রূ বাঁকা করে তাকায়।

—পরিচয় দেওয়া কি একটা সমস্যা, চল না, জায়গামতো পৌঁছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

অরুণ একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, চল তাহলে। পাহাড়ে একটা ছোটখাট এক্সকারসনও হয়ে যাবে এই সুযোগ।

—ক্যামেরাটা নিতে ভুলিস না যেন। ফিল্ম আছে তো?

—সে আমি আজই লোড করে রাখব। তোর টেপ রেকর্ডারটাও সঙ্গে নিস, কাজে লাগতে পারে।

রঘু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল, কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে বলল, দাদাবাবু একটা কথা বলব, আমাকেও নিয়ে চলুন না?

—তোকে নিয়ে যাব! তুই কোথায় যাবি? কৌতুকে তাকাল অরুণ।

—এই যে আপনারা কোথায় যাবেন, সেখানে আমি না থাকলে আপনাদের কষ্ট হবে দাদাবাবু। রঘুর চোখ ছলছল করে ওঠে।

—শোন কথা, আমরা কি বেড়াতে যাচ্ছি নাকি! যত তোর বয়স বাড়ছে রঘু, তত তোর মাথার ঘিলু কমে যাচ্ছে। হা হা করে হেসে ওঠে অরুণ।

ব্রতীশ বলে, তুমি যদি সঙ্গ ধর রঘু, এ বাড়ি কে পাহারা দেবে শুনি? তাছাড়া আমরা দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

রঘু চুপ করে গেল। কিন্তু মুখটা কেমন ভার হয়ে রইল ওর।

ব্রতীশ বলল, তাহলে ওই কথাই পাকা, কালই আমরা রওনা হচ্ছি। সুভদ্রাদেবীকে ফোনে জানিয়ে দিস।

অরুণ বলল, ঠিক আছে।

শিয়ালদা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কার্শিয়ং ঘুমিয়ে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে কেটে গেল। কার্শিয়ংয়ে ওরা যখন পৌঁছল তখন দুপুর প্রায় একটা। অরুণের কাঁধে একটা সাইড ব্যাগ, ব্রতীশের হাতে একটা হালকা সুটকেশ। মালপত্র বলতে এটুকুই। শিলিগুড়িতেই ওরা পোশাক পালটিয়ে গরম জামা-কাপড় পরে নিয়েছিল। কার্শিয়ংয়ে মধ্য দুপুর হলেও বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। কিন্তু এই কনকনে ঠাণ্ডার ভেতরও তরল রোদে বেশ এটা আমেজভরা পরিবেশ।

ব্রতীশ বলল, হোটেল-টোটেল পরে খোঁজ করা যাবে, আগে চল, লোকাল থানায় একবার দেখা দিয়ে আসি।

অরুণ আপত্তি করল না। থানায় জানিয়ে রাখা ভাল। তাছাড়া ওখান থেকেও নীল টেম্পল সম্পর্কে কিছু না কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।

ওরা ছোট একটা টিলা ভেঙে থানায় এসে হাজির হল।

বরাত ভালো থাকলে এ রকমই হয়। থানার ও-সি মিস্টার মুখার্জির দিকে তাকিয়ে ব্রতীশ লাফিয়ে উঠল, আরে শ্যাম তুই ?

ও-সি শ্যাম মুখার্জি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কে রে বাবা ! চেনা-চেনা লাগছে, অথচ—

—চিনতে পারলি না, আমি ব্রতীশ, এখন লালবাজারে আছি।

এইবার জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল শ্যামের। ব্রতীশ ! যাহ্ বাবা, কত পালটে গেছিস রে, তোকে তো আর চেনাই যায় না। তারপর কি মনে করে, এখানে ?

—আরে ভাই, একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম, থানায় আমাদের উপস্থিতিটা আগেই জানিয়ে রাখি। পরিচয় করিয়ে দেই, এ আমার বন্ধু অরুণ সেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লাইনে এখনো খুব পাকা হয়ে ওঠে নি। তাই আমিও সঙ্গে এলাম।

অরুণ আর শ্যাম প্রতি নমস্কার করল।

শ্যাম শুধাল, কি কেস ? কার্শিয়াংয়েই না আর কোথাও ?

—নীল টেম্পলে। টেম্পলের ব্যাপারে একটু খোঁজ করার জন্য এসেছি।

—কোন নীল টেম্পল ? জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় শ্যাম।

—নীল টেম্পল অনেকগুলো আছে নাকি ? নীলঝোরার কাছে যে নীল টেম্পল, সেখানে যেতে হবে।

—নীলঝোরা সে তো বেশ দূরে। হ্যাঁ, নীল টেম্পল নামে একটা পাহাড় ওখানে আছে বলে শুনেছি। কিন্তু কি হয়েছে ওখানে ?

ব্রতীশ শুধাল, তোর থানার মধ্যে পড়ে না ? কেমন একটু হতাশ দেখাল ব্রতীশকে।

শ্যাম বলল, থানার এলাকায় পড়বে না কেন, তবে ওদিকে মানুষজন কম, ফলে যাবার দরকার হয় না। কি হয়েছে ওখানে?

—আর বলিস কেন ভাই, ওই টেম্পলে নাকি দনুজদলন দেববর্মন নামে একজন মিস্ট্রিয়াস ভদ্রলোক আছেন, তাঁর রহস্যটা ভেদ করতে হবে।

অরুণ আরো খোলসা করে বলল, ওই ভদ্রলোক নাকি তাঁর স্ত্রীর ডেড-বডি গুহার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। প্রিজার্ভ করছেন। ব্যাপারটা কতদূর সত্যি জানতে হবে।

—তাই নাকি! ভারি ইণ্টারেস্টিং তো? ডেড-বডি প্রিজার্ভ করছেন মানে?

—মৃত্যুর পর দেহটাকে নষ্ট করেন নি। মানে, দাহও করেন নি, কবরও দেন নি।

ব্রতীশ বলল, আজ তো এখানেই থাকছি, পরে সব তোকে বলব। এখন একটা হোটেল দেখতে হবে। কোথায় উঠি বলতো?

শ্যাম হাসে, হোটেলে কি হবে? আমার ওখানেই চল। মিসেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আসুন অরুণবাবু, আসুন।

মুখার্জির বাড়িতেই সেদিনের মতো আশ্রয় নিল ওরা। পরদিন একটা জিপ সংগ্রহ করে দিল শ্যাম। জানাশোনা জিপ। ড্রাইভারের নাম মঙ্গল সিং। মাঝারি বয়স। পাহাড়ের রাস্তা বেশ ভালই চেনা আছে। বলল, নীলবাংলোয় পৌঁছতে রাস্তা যদি ঠিক থাকে ঘণ্টা তিনেক লাগবে।

তিন ঘণ্টা, তাঁর মানে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বেরুনই ভাল। খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরের পরেই ওরা জিপে উঠল।

আর নীলঝোরা ডাক-বাংলোয় পৌঁছবার মাইল দেড়েক আগে সুন্দরগাঁওতে যখন এসে পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

সুন্দরগাঁও বেশ বড়সড় বাজার বিশেষ। মঙ্গল সিং গাড়ি দাঁড় করাল, বাবুজী চা খেয়ে নিন। নীলঝোরার বাংলোয় যেতে রাত হয়ে যাবে।

তাই ঠিক হল। গরম গরম সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে। সিঙ্গাড়া আর চা খাবার জন্য জিপ থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানে ঢোকে ওরা। দোকানে খদ্দেরের অভাব নেই। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকেই বসে আড্ডা জুড়েছে। হঠাৎ সেখানে জিপ থেকে নেমে দু'জন পরদেশীকে ঢুকতে দেখে সবারই কেমন কৌতূহল।

ব্রতীশ আলাপ জমাবার চেষ্টা করল দু-একজনের সঙ্গে, এই যে ভাইসাব, নীলঝোরা কতদূর এখান থেকে?

অল্পবয়সী এক ছোকরা উত্তর দিল, জাদা নেহি, থোড়া কুছ।

—ওখানে তো ডাকবাংলো আছে, তাই না? কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে তো?

—জী সাব।

খুব সংক্ষেপে উত্তর। হয়তো পরদেশী দেখেই খানিকটা গুটিয়ে গিয়েছিল ছেলেটি।

অরুণ নীল টেম্পলের প্রসঙ্গ টানল, নীল টেম্পল কতদূর ভাই?

পাশের একটা লোক কেমন সন্দেহের চোখে তাকাল, আপলোগ টেম্পল যাইয়ে গা?

অরুণ হাসে, সে রকমই তো ইচ্ছে। এত দূর এলাম, নীল টেম্পল না দেখে কি ফেরা উচিত? কতদূর ভাই?

—উতো বহুৎ খতরনক জায়গা বাবুজী।

—কেন, খতরনক কেন? অরুণ আরো কিছু শোনার জন্য তাকিয়ে থাকে।

বুড়ো মতো এক পাহাড়ী ও-পাশে এতক্ষণ অরুণদের কথায় কান পেতে ছিল, এগিয়ে এল, মাত যাইয়ে বাবুজী। ওখানে গেলে কেউ জিন্দা ফিরে আসে না।

—সে আবার কি কথা, কি আছে ওখানে ?

—নেহি বাবুজী, নীল বাংলো পর্যন্ত যেতে অসুবিধা নেই। ওখান থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

ব্রতীশ হাসে, ঠিক আছে টেম্পলে যাব না। কিন্তু ভাই লোকে ওখানে গেলে আর ফেরে না কেন ?

বুড়োটার গায়ে পাহাড়ী একটা ভারি কম্বল জড়ানো। চোখ দুটো কেমন হলদে। কথা বলার ধরনে বেশ অভিজ্ঞতার ছাপ। তড়বড় করে অনেক কথাই বলে গেল লোকটা। যা বলল তার একটাই অর্থ, ওটা একটা অভিশপ্ত জায়গা বাবুজী। যত রাজ্যের জিন-পরীরা ওখানে আস্তানা গেড়েছে। ফলে জ্যান্ত মানুষ ওখানে গেলে ওদের হাতে পড়ে খতম হয়ে যায়।

—তোমরা কখনো যাও না ওদিকে ? প্রশ্ন করে অরুণ।

—নেহি বাবুজী।

—আদমি সব বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে, তোমরা খোঁজ করে দেখ না কেন ?

লোকগুলো পরস্পর মুখ চাওয়াচাইয়ি করে।

অরুণ বলল, কিন্তু আমরা তো শুনেছিলাম, ওখানে এক রাজাবাবু থাকেন।

বুড়োটা আবার সরব হল, হ্যাঁ বাবু, থাকতেন। তবে এখন আর নেই। বোধহয় মরে গেছেন।

—মরে গেছেন ! অরুণ তাকাল ব্রতীশের দিকে।

—হ্যাঁ বাবুজী, এক সাল হল আমরা কেউ আর ওঁকে দেখি নি। আগে প্রত্যেক মাসেই দু'-একবার রাজাবাবু এদিকে বাজার করতে আসতেন।

রাজাবাবু বলতে ওরা কাকে বুঝছে তা ঠিক করে নেবার জন্য অরুণ শুধাল, রাজাবাবু মানে দনুজদলনবাবু তো ?

—হ্যাঁ বাবুজী। এক সাল হো গিয়া, উনকো কোই পাত্তা নেই।

অরুণ আবার ব্রতীশের দিকে তাকায়, কি বলে রে ?

ব্রতীশ নির্বিকার। অরুণের কথায় উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করে, রাজাবাবু আর এদিকে আসে না, তার মানে মরে গেছে এটা ভাবা কি ঠিক হচ্ছে ?

—জিন্দা থাকলে জরুর দেখা হত।

বুড়োর কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে আর একজন বলে উঠল, রাজাবাবু জরুর মর গিয়া বাবুজী ! উনকা সাথ লম্বু থা, লম্বু ভী ভাগ গয়া।

—লম্বু, সে আবার কে ?

—রাজাবাবুর সঙ্গে ঢ্যাঙা লম্বা একজন থাকত বাবুজী। ও পালিয়েছে।

—পালিয়েছে, কোথায় পালাল ?

—কাঁহি দিল্লী কলকাত্তা হোগা, চলা গয়া।

—কি নাম লোকটার ?

—লম্বু বাবুজী।

—লম্বু ?

—হ্যাঁ বাবুজী, লম্বু।

ওদিকে জীপের ড্রাইভার মঙ্গল ততক্ষণে এগিয়ে এসেছিল, সঙ্গে আর একটা লোক, মাঝারি বয়স, পায়ে ভারি জুতো গায়ে ভারি একটা কম্বলের জামা।

মঙ্গল বলল, বাবুজী চৌকিদারকে পেয়ে গেছি। এই যে নীল বাংলোর চৌকিদার মুংরু সিং।

মুংরু হাত তুলে নমস্কার জানাল। কেমন সপ্রতিভ ভঙ্গি।

ব্রতীশ বলল, আমরা তোমার অতিথি হওয়ার জন্য এসেছি মুংরু ভাই।

মুংরু গদগদ ভঙ্গি করে হাসল, তারপর স্পষ্ট বাংলায় বলল, বাংলোর ধারেকাছে আর কোন দোকান নেই স্যার, যা কেনার এখান থেকেই কিনে নিতে হবে।

—বাহ্, ভালো বাংলা বলো তো ?

মুংরু সলজ্জ একটু হাসল, পাহাড়ী লোক হলেও শিলিগুড়িতেই মানুষ হয়েছি স্যার। শিলিগুড়ির কাছে একটা ডাক বাংলোয় অনেক দিন কাজও করেছি।

—তাই নাকি ? তা, এ বাংলোয় কতদিন আছ ?

—পাঁচ বছর হয়ে গেল স্যার, বছরের পর বছর একা পড়ে থাকি, মাঝে মাঝে এই বাজারে আসি। আপনাদের জন্য ডিম মুরগী কিছু কিনে নেব স্যার ?

ব্রতীশ দুটো দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল, খেতে তো হবেই, নিয়ে নাও কিছু। তারপর চলো, জিপে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

—ঠিক আছে স্যার। আমি এক্ষুনি আসছি। মুংরু চলে গেল।

ব্রতীশ আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল, লম্বু রাজাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকত, কি করত ?

—কুছ নেহি বাবুজী। রাজাবাবুকা নোকর থা ওই লম্বু।

—রাজাবাবুর আর কেউ নেই ?

লোকগুলো আবার মুখ চাওয়াচাইয়ি করে, কভি দেখা নেহি বাবুজী।

—তোমরা কেউ কখনো লম্বুকে জিজ্ঞেস কর নি ?

—লম্বু তো কিসিকা সাথ বাতচিত নেহি করতা থা বাবুজী। বিলকুল আলাগ আলাগ রয়তা থা।

—তাই বুঝি। ঠিক আছে, টেম্পলে যেতে বারণ করছ যখন যাব না।

ততক্ষণে চা বিস্কুটও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ওদের। ব্রতীশ উঠে দাঁড়াল, আয় অরুণ, একটু বাইরেটা দেখি।

দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে ওরা। সদর রাস্তার দু'পাশে বেশ কিছু দোকান, ইলেকট্রিক লাইট নেই। হ্যাজাক জ্বালিয়েছে কেউ কেউ। দূরে জিপের কাছে তখন বেশ কিছু বাচ্চাকাচ্চার ভিড়।

অরুণ ফিসফিস করে বলল, কেমন সব গোলমেলে মনে হচ্ছে না! কলকাতায় সুভদ্রাদেবীর কাছে যা শুনে এলাম, কিছুই মিলছে না কিন্তু!

ব্রতীশ হাসে, এখন কেবল শুনে যাওয়াই ভালো। রাতে চৌকিদারের কাছ থেকে খবর বার করে নেব। তেমন বুঝলে কালই ভোরে ভোরে নীল টেম্পলের দিকে হানা দেব।

—তা না হয় হবে, কিন্তু রাজাবাবু সত্যি সত্যি যদি মরে গিয়ে থাকে?

—অসম্ভব, হতেই পারে না। আর ধর যদি মরেই গিয়ে থাকে তাহলে তো ভালোই হল। কেবল রাণীমার বডিই না, রাজাবাবুর বডিও প্রিজার্ভ করা অবস্থায় দেখতে পাব।

অরুণ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, মঙ্গল ড্রাইভার এগিয়ে এসে ডাকল, আইয়ে বাবুজী, মুংরু আ গয়া।

ব্রতীশ বলল, ঠিক আছে, চলো। জীপের কাছে এগিয়ে এল ওরা। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে নিল অরুণ। ব্রতীশের গায়ে আগে থেকেই একটা চামড়ার জ্যাকেট। হালকা একটা কাপড়ের টুপি পরে নিল ব্রতীশ।

মুংরুকে দেখা গেল, গাড়ির ভেতর ঢুকে জড়সড় হয়ে বসে আছে। একটা মুরগীও যোগাড় করে ফেলেছে। পাশে একটা ব্যাগ, তাতে কিছু তরিতরকারি।

ব্রতীশ বলল, আয় অরুণ, আমরা সামনে না বসে ভেতরেই বসি। মুংরুর সঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

ড্রাইভার খানিকটা আপত্তি করলেও ওরা কান দিল না, জিপের পেছন দিক দিয়ে উঠে ভেতরে গিয়ে বসে পড়ল।

—চলো ড্রাইভারজী, এবার সোজা বাংলোয়।

মঙ্গল সিং একবার পিছন ফিরে তাকাল, তারপর সশব্দে গাড়িটা সামনের দিকে ছুটিয়ে দিল। মিনিট তিন চারেকের মধ্যেই সুন্দরগাঁওটা পেছনে পড়ে গেল।

মুংরু কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল। ব্রতীশ শুধাল, তোমাকে বাজার করার জন্য এতদূর আসতে হয়, বাংলোর ধারেকাছে কোন বাজার নেই ?

মুংরু বলল, না স্যার। বাজার তো দূরের কথা ধারেকাছে একটা বাড়িও নেই।

—রোজ আসো এখানে ?

—না স্যার। মাঝে মাঝে আসি, মাইল দেড়েক রাস্তা, বেড়াতে বেড়াতে চলে আসি। বাংলোয় কোন যাত্রী এলে সুন্দরগাঁওতেই দেখা হয়ে যায়। তবে যাত্রী এখানে খুব একটা আসে না স্যার।

—বাংলোটা তাহলে ফাঁকাই থেকে যায় ?

—তা স্যার সারা বছরই প্রায় ফাঁকা থাকে। তবে এখন একজন ভদ্রলোক রয়েছেন।

—তাই নাকি ? একা ?

—একা না স্যার। স্ত্রীকেও সঙ্গে এনেছেন। মাইজী খুব ভালো।

—বটে বটে, খুব রসিক লোক তাহলে।

মুংরু বলল, সাহেব কিন্তু বাঙালী নন, তবে খুব ভালো বাংলা বলতে পারেন। আর মাইজী বাঙালীদের মতো শাড়িও পরেন।

—তাই নাকি, কোথাকার লোক ?

—ঠিক জানি না স্যার। এসে অবধি সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ান। কেবল রাতেই বাংলোতে কাটান।

—ভারি ইণ্টারেস্টিং তো।

অরুণ জিজ্ঞেস করল, জঙ্গলে ঘোরেন কেন ? কি আছে জঙ্গলে ? কি করেন ভদ্রলোক ?

—আমি ঠিক বুঝি না স্যার। সকাল হতেই নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়েন। কখনো দুপুরে ফেরেন, কখনো ফেরেন না।

—একা ?

—কখনো একা ; কখনো মেমসাহেবও সঙ্গে বেরন।

—জিজ্ঞেস কর না, কোথায় যান ?

—না স্যার। অপরাধীর মতো তাকায় মুংরু।

এমন সময় অরুণ হঠাৎ প্রশ্ন করল, তুমি টেম্পলে যাও না মুংরু ?

—আমি। মুংরু কেমন বোকার মতো তাকাল, না স্যার। ও খুব খারাপ জায়গা। ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করি, ওদিকে না যাওয়াই ভালো।

মুংরুর চোখের দিকে তাকাল ব্রতীশ। তা অবশ্য ঠিক, ওই ভূত প্রেতের আড্ডায় না যাওয়াই ভালো। আচ্ছা রাজাবাবু সম্পর্কে যা শুনলাম, তা কি ঠিক ?

—কি কথা স্যার ? মুংরুর চোখদুটো ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

—রাজাবাবু নাকি বছর খানেক হল মারা গেছেন ?

—আমি ঠিক জানি না স্যার। তবে সবাই বলে, রাজাবাবু আর বেঁচে নেই।

—রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল না ?

—তেমন একটা ছিল না স্যার ! তবে, মাঝে মাঝে উনি বাংলোয় আসতেন। খানিকক্ষণ বসেটসে আবার চলে যেতেন। ব্যস ওই পর্যন্ত।

ব্রতীশ একটু ঝুঁকে বসল, রাজাবাবু এখন আর আসেন না ?

অনেকদিন আসেন নি স্যার।

—আর সেই যে লম্বু না কি বলল ওরা, সেই লোকটা ?

—আমি চিনি না স্যার।

ব্রতীশ এবার মুংরুর পিঠে হাত রাখল, নীল টেম্পলের এত কাছে থাক, অথচ কিছুই খবর রাখ না দেখছি ?

মুংরু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। গাড়িটা ততক্ষণে আবার চড়াই ভাঙতে শুরু করেছে। অরুণ গাড়ির সামনের কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তার দু'পাশেই ঘন জঙ্গল। কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে চারপাশ।

আরো খানিকটা এগোতেই হঠাৎ যাদুমন্ত্রের মতো যেন বাংলোটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। পুরনো একটা কাঠের বাড়ি! ওপরে টিন বা অ্যাসবেসটসের চাল রয়েছে। বাড়িটার সামনে সুন্দর একটা লন। সেখানে একটা হাজাক জ্বলছে।

মুংরু বলল, হ্যাঁ স্যার, ওটাই নীল বাংলো। আমরা পৌঁছে গেছি। জিপটাকে লন অবধি তুলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল মুংরুই।

গোঁ গোঁ করে জিপটা উঠে এল উপরে।

এবার নামার পালা। জিপ থেকে নামতে নামতে অরুণ বলল, চমৎকার জায়গা। সামনেই হ্যাজাক জ্বলছে বলে দূরের কিছুই ভাল করে চোখে পড়ে না। তবে বাংলোটা যে একটা পাহাড়ের মাথায়, খানিকটা সমতল জমির ওপর তা বেশ বোঝা যায়।

বাংলোর সবগুলো দরজাই বন্ধ বলে মনে হল ওদের। মুংরু বলল, সেই চার নম্বরের সাহেব এখনো ফেরেন নি স্যার। আপনারা আসুন। জিপ থেকে ছোট হালকা সুটকেসটা হাতে তুলে নিল মুংরু।

—ভদ্রলোক কোন ঘরে থাকেন মুংরুভাই? প্রশ্ন করল ব্রতীশ।

মুংরু বলল, স্যার ওদিকে চার নম্বরে। আপনারা এ ঘরটা নিন। ঘুম ভাঙলেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাবেন।

ব্রতীশ আপত্তি করল না, ঘর একটা হলেই হল।

দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল মুংরু। বড় টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিতেই ঘরের সমস্ত কিছু চোখের ওপর ভেসে উঠল। মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছোন। প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় পাশাপাশি দুটো কট। এক পাশে কাঠের আলমারি, এক পাশে সোফাসেট আর টেবিল।

—সেই ইংরেজ আমলের বানানো বাংলো, নইলে এত জায়গা নষ্ট করে ঘর হয় না।

মুংরু বলল, স্যার আপনারা একটু সোফায় বসুন, আমি চাদর পেতে দিচ্ছি। তারপর আপনাদের চা করে আনছি।

ব্রতীশ বলল, না না, এখন ঘরে বসব কি হে, বারান্দায় চেয়ার নেই ? বারান্দায় গিয়ে বসি। আয় অরুণ, আমরা বাইরে যাই।

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। বারান্দাতে অনেকগুলো পিঠ এলানো বেতের চেয়ার। আরামে পা ছড়িয়ে বসা যায়। কিন্তু ব্রতীশরা বসল না, চল চারপাশটা একবার দেখে নেই পরে বসা যাবে।

বারান্দা থেকে ওরা লনে নেমে এল। লনের শেষ প্রান্তে বেশ কিছু ফুলের গাছ। টর্চের আলো ফেলে গাছগুলি চিনবার চেষ্টা করল অরুণ। আর ঠিক এ সময়ই ও চমকে উঠল, এই ব্রতীশ, ওদিকে দেখ।

ব্রতীশও চমকে উঠে তাকাল, কি রে ?

—ওই যে অনেক দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে, দেখ দেখ, কি মজার ব্যাপার !

ব্রতীশেরও চোখে পড়ল আলোটা। বড় একটা রঙিন কাগজের ফানুশের মতো, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলে উঠছে।

—সত্যি অদ্ভুত তো ! মনে হচ্ছে কেউ যেন ইচ্ছে করে হঠাৎ হঠাৎ নিভিয়ে দিচ্ছে, আবার জ্বালাচ্ছে। কি ব্যাপার বল তো ?

ততক্ষণে জিপের ড্রাইভার মঙ্গল সিং এগিয়ে এসেছিল, স্যার আমি কি থাকব ? না চলে যাব ?

ব্রতীশ যেন শুনতেই পায় নি, এমন ভঙ্গি করে বলল, ওই আলোটা কি হে ?

মঙ্গলও অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে রইল আলোটার দিকে।

—নীল টেম্পলটা কোন দিকে, চেন ? প্রশ্ন করে অরুণ।

মঙ্গল এ অঞ্চলের লোক নয়, ওর পক্ষে চেনা হয়তো সম্ভব নয়, তবু যদি কিছু বলতে পারে এই আশাতেই প্রশ্ন করা।

মঙ্গল আমতা আমতা করে বলল, স্যার ওই দিকেই হতে পারে।

—হতে পারে বললে হবে না, সঠিক জান কিনা বল ? মুংরু কোথায়, মুংরুকে ডাক দেখি ?

—দেখছি স্যার। মঙ্গল বাংলোর আউট হাউসের দিকে মুংরুকে খুঁজতে চলে গেল।

অরুণ বলল, মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। মনে হচ্ছে, কেউ যেন সিগন্যাল দিচ্ছে। এই দেখ দেখ, আবার নিভে গেল।

—সিগন্যালটা কি বাংলোর দিকেই দিচ্ছে! না কি আর কোথাও!

আবার জ্বলে উঠল আলোটা। আর ঠিক এ সময়ে এসে হাজির হল মুংরু।

—ডাকছিলেন স্যার?

—ওই আলোটা কি হে?

—ওটা স্যার, খারাপ আলো। তাকাবেন না।

—মানে?

—নীল টেম্পলের দিক থেকে রোজ ওরকম আলো জ্বলে ওঠে স্যার। ও-গুলো সব ভূতুড়ে আলো। সারারাত ওখানে জিন-পরীরা ঘুরে বেড়ায়, ওরাই ওরকম আলো দেখায়।

—বটে, নীল টেম্পল কতদূর এখান থেকে?

মংরু বলল, তা, মাইল দুয়েক হবে স্যার। লোকজন খুব একটা ওদিকে যায় না বলে রাস্তাটাস্তা তেমন কিছুই নেই। তাছাড়া মাইলখানেক নিচে নামলেই একটা পাহাড়ী নালা আছে, ভীষণ খারাপ।

—কি রকম?

—জলের সাংঘাতিক কারেন্ট স্যার। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর পা রেখে লাফিয়ে পার হতে হয়। পড়ে গেলেই জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

—তাই নাকি! তাহলে তো কাল সকালেই একবার নালাটা পার হয়ে দেখে আসতে হয়।

মুংরু চুপ করে গেল।

মঙ্গল এতক্ষণ কথা শুনছিল। শুধাল, স্যার আমাকে কি ছেড়ে দেবেন? আমি কি চলে যাব স্যার?

আলোটা আবার নিভে গেল। ব্রতীশ মঙ্গলের দিকে তাকাল, কালকের দিনটা থেকেই যাও না, ও-সিকে আমি না হয় বলে দেব।

মঙ্গল মাথা নাড়ল, ঠিক আছে স্যার, গাড়িটা তাহলে নিচে ওই সুন্দরগাঁওয়ের বাজারে নিয়ে যাই। কাল সকাল সকাল না হয় আবার চলে আসব।

ব্রতীশ আপত্তি করল না, ঠিক আছে, তাই যাও। এসো কিন্তু।

ছাড়া পেয়ে মঙ্গল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এগিয়ে গিয়ে জিপে উঠে বসল।

ওদিকে আলোটা অনেকক্ষণ ধরে নিভে আছে। শব্দ করে জিপটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়ার পর ব্রতীশ শুধাল, কি হে মুংরু, আলোটা আর জ্বলছে না যে?

মুংরুকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, কোন ঠিক ঠিকানা নেই স্যার, কখনো জ্বলে কখনো নেভে। প্রত্যেকদিন রাতেই ও-রকম হয়। আপনাদের জন্য চায়ের জল চাপিয়ে রেখে এসেছি স্যার? চা নিয়ে আসব?

অরুণ টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখল, আটটা বাজে, এখন চা! ঠিক আছে হবে'খন। আচ্ছা, চার নম্বরের ভদ্রলোক এখনো যে ফিরলেন না?

মুংরু বলল, কোথায় জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াচ্ছেন কে জানে! ওরা স্যার দুজনেই একটু ক্ষ্যাপা ধরনের।

—তাই বুঝি! কিন্তু অন্ধকারে জঙ্গলের কোথায় ঘোরেন ওঁরা? জিজ্ঞেস করো না?

—না স্যার।

অরুণ চুপ করে গেল। আলোটা আর জ্বলছে না। দূরে জঙ্গলের দিকে টর্চ ঘোরাল। না কিছুই ভাল করে বোঝার উপায়

নেই। চাঁদের আলো থাকলে কিছুটা আঁচ করা যেত। কিন্তু এ একেবারে নিরেট বলে মনে হচ্ছে সব কিছু।

—আচ্ছা, এর আগে পট্টনায়েক বা মাধবায়ণ, নামে কোন লোক এসেছিল এখানে?

মুংরু বোকার মতো তাকাল, কত লোকই তো আসে স্যার। সব নাম কি মনে থাকে!

—মনে পড়ছে না! ঠিক আছে, তোমার রেজিস্টারটা একটু দেখাবে?

—কেন দেখাব না স্যার। নিয়ে আসব?

ব্রতীশ বাধা দিল, এখন থাক। পরে একসময় দেখে নেব। চল অরুণ, বারান্দায় গিয়ে বসি।

—আমি তাহলে যাই স্যার? চা নিয়ে আসি? ঘরের চাদরটাদর সব পাল্টে দিয়েছি, ঘরে বসেও বিশ্রাম করতে পারেন স্যার।

মুংরু ধীরে ধীরে আবার সরে গেল।

ব্রতীশ বলল, আজকের রাতটা ভাল মানুষের মতো কাটিয়ে দেওয়াই ভাল। কাল খুব ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়তে হবে। বলতে বলতে একটা চেয়ারের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল ব্রতীশ। এমন সময় মনে হল, ওপাশের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কে যেন উঠে আসছে। টর্চের আলো ফেলে ফেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছে।

আবার শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

—সেই চার নম্বরের সাহেব বোধহয় ফিরছেন।

—হ্যাঁ সে রকমই মনে হচ্ছে।

আরো একটু অপেক্ষা করার পর ওরা বুঝতে পারল, ওদের অনুমানই ঠিক। বেশ পাতলা লম্বা চেহারার এক ভদ্রলোক, পরনে স্যুট, হাতে টর্চ। মাথায় ঘাড়-ঝোলানো চুল সারামুখ প্রায় দাড়িগোঁফে ঢাকা। পিছনেই শাড়ি পরা এক মহিলা। পাহাড়ের চড়াই ভেঙে ভেঙে দু'জনেই কিছুটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন।

ব্রতীশ আর অরুণ তাকিয়ে থাকে আগন্তুকদের দিকে।

আগন্তুকরা আরো খানিকটা সময় নিল বাংলোর লনে উঠতে। তারপর বারান্দায় ব্রতীশ আর অরুণকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল।

ব্রতীশ স্বাগত জানাল ওদের, আসুন দাদা, নমস্তে।

দু'জনেই কেমন অবাক, আপনারা ?

ব্রতীশ হাসল, এই বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম। এক নম্বরে জায়গা হয়েছে আমাদের। মুংরুর মুখে আপনাদের কথা শুনেছি।

ভদ্রলোক আরো কাছাকাছি এগিয়ে এলেন, কখন এলেন ?

ব্রতীশ লক্ষ্য করল, বেশ স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ, বলল, এই তো আধ ঘণ্টাও হয় নি। এসেই আপনাদের কথা শুনলাম, কোথায় গিয়েছিলেন ?

ভদ্রলোক তার স্ত্রীসহ বারান্দায় উঠে এলেন, আগে আমরা পরিচয়টা সেরে ফেলি, আমি ইন্দর সিং একজন ইউ পি ম্যান। আর ইনি আমার স্ত্রী, রেখা। সী ইজ এ বেঙ্গলী লেডি।

—বটে, বাঙালী বিয়ে করেছেন! তাহলে তো মশাই বিবাহ সূত্রে আপনিও বাঙালী।

প্রাণ খোলা হেসে উঠল ইন্দর সিং, তা বলতে পারেন। জন্ম থেকেই মশাই কলকাতায় কাটিয়েছি। বাঙালী ছাড়া কী আর! নেহাৎ সংস্কার, তাই পরিচয় দিতে গিয়ে দেশের কথাটা না বলে পারি না।

বারান্দায় চেয়ার টেনে টেনে বসে পড়ল ওরাও।

—তা ক'দিন থাকবেন বলে এসেছেন ? প্রশ্ন করলেন সিং।

ব্রতীশই কথা বলছিল, বলল, খুব নাম শুনেছিলাম এই বাংলোটার, আসি আসি করে আসা হয় না, এবার চলে এলাম। ভালো লাগলে কয়েকটা দিন থেকে যাব। আপনারা কবে এসেছেন ?

—আমাদের কথা আর বলবেন না। এই জঙ্গলের নেশায় পড়ে গেছি। মাঝে মাঝেই আসি আমরা। তবে একটা সত্যি কথা বলব, আমি মশাই হাঁপিয়ে উঠেছি। কিন্তু রেখা আমার ঠিক উল্টো, এ-রকম নির্জনতার নাকি আলাদা একটা চার্ম আছে। কি, তুমিই বলো না রেখা ?

রেখা নির্ভেজাল বাঙালী। চোখেমুখে ষোল আনাই বাঙালী মধ্যবিত্তের ছাপ। পরনে শাড়ি, গায়ে একটা ফুল স্লিভ সোয়েটার। কপালে সিঁদুর না টিপ ওটা, বোঝা যায় না। হাসল, খারাপ কি বলুন, সারাদিন কলকাতা শহরের ট্রাম-বাসের শব্দ, কয়েকটা দিন এখানে তবু নিরিবিলিতে কাটানো যাচ্ছে।

অরুণ শুধাল, কি দেখার আছে এখানে ?

—সে রকম যদি বলেন, কিছুই নেই। তবে জঙ্গল যদি পছন্দ করেন, আইডিয়াল জায়গা। এই তো সেই দুপুরে বেরিয়েছিলাম, এখন ফিরছি।

—সারাক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে কাটালেন ?

—নিচে একটা পাহাড়ী নালা আছে, ওখানে গিয়েছিলাম। উত্তর করল রেখা।

ইন্দর সিং কথা কেড়ে নিলেন, ভারি ইণ্টারেস্টিং জায়গা। কত রকম পাখি, বিকেলের দিকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর ময়ুব আপনার চোখে পড়বেই। গতকালই তো আমরা একঝাঁক হরিণ দেখেছিলাম।

—বটে বটে ! হরিণও আছে নাকি ?

—কেবল হরিণ না। বাঘও আছে। মাঝে মাঝে ওই নালার ধারে জল খেতে আসে।

—বাঘ ! ব্রতীশ কেমন ভ্রু বাঁকা করে তাকায়।

—ম্যান ইটার নয় বলেই রক্ষে। বরং উল্টোটাই। মানুষ দেখলে ভয়ে পালায়। বলো না রেখা, আমরা সেদিন বাঘ দেখি নি ?

—নামেই বাঘ, আসলে কুকুরের মতো দেখতে।

—বাঘ ইজ বাঘ। তা সে কুকুরের মতোই হোক, আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারই হোক। আমি মশাই ও জীবটাকে একদম পছন্দ করি না।

—তা তো বটেই, ব্রতীশ বলল, সাপ বাঘ চিরকালই মানুষের শত্রু। হাসল, আর কি দেখার আছে বলুন?

—আর কি দেখবেন! সবই তো জঙ্গল। ভোরবেলা অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পারেন। আমরা মাঝে মাঝে এই বারান্দায় বসে বরফ ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙের খেলা দেখি। বেশ কেটে যায় সকালটা।

হঠাৎ ব্রতীশই প্রশ্নটা তুলল, আচ্ছা কাছাকাছি একটা টেম্পল না কি যেন আছে?

—আর বলবেন না মশাই, ও এক মজার ব্যাপার। আমরাও প্রথম এসে শুনেছিলাম, রাজা বিম্বিসারের আমলের এক ধ্বংসাবশেষ। ভেবেছিলাম, কত কিছু না দেখা যাবে, কিন্তু খুব ডিজহার্টেন হয়ে ফিরে আসতে হল।

—কেন, কেন?

—রেখা বলল, আসলে টেম্পল ফেম্পল বলে কিছুই নেই, দুর্গম একটা পাহাড়ের ঢিবি। লোকের মুখে শুনলাম, বিষাক্ত সব সাপের আড়ৎ নাকি ওই ঢিবিটা। ফলে আর ওখানে কে যায় বলুন!

—কোন লোক থাকে না ওখানে?

ইন্দর সিং তাকাল। ঘোলাটে চোখের পাতা বোধহয় একটু কেঁপে উঠল, লোক থাকবে কি মশাই, মুংরুকে জিজ্ঞেস করুন না, যত রাজ্যের ভূত প্রেতের আস্তানা ওটা। কে মশাই খুঁচিয়ে ঘা করে।

মুংরু চায়ের পট নিয়ে হাজির হল এ সময়।

অরুণ বলল, বসুন, চা খান।

ইন্দর সিং বলল, ধন্যবাদ। কাল সকালে বরং একসঙ্গে খাওয়া

যাবে। এই তো সবে ফিরলাম। এখন একটু হাত মুখ ধুতে হবে। আপনারা খান। গুড নাইট।

রেখা আর ইন্দর সিং উঠে দাঁড়াল। তারপর বারান্দা ঘুরে ওপাশে ওদের চার নম্বর রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অরুণ, ভারি অভদ্র তো!

ব্রতীশ মৃদু একটু হাসে, চায়ে বিষ বা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিচ্ছ কিনা, সেটা বুঝতে একটু সময় নেবে না!

—মানে?

—মানে বুঝতে পারছিস না! আমাদের দেখে ওরা একটু যে অস্বস্তিতে পড়েছে, বুঝতে পেরেছিস?

অরুণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

ব্রতীশ বলল, রাতে শোয়ার সময় সব বলব। এখন শুধু বলে রাখি, ওদের দু'জনকেই ওয়াচে রাখা দরকার। ওরা যে প্রকৃতি-প্রেমিক বলে নিজেদের প্রমাণ করতে চাইছে, ঘটনাটা হয়তো আদৌ তা নয়। তাছাড়া ইন্দর সিং এত স্পষ্ট বাংলা বলে এটাও সন্দেহ হওয়ার মতো।

—তার মানে লোকটা উত্তর প্রদেশের নয় বলছিস?

বলছি না ঠিক, তবে আমাদের কাজই হচ্ছে লোককে সন্দেহ করা। হয়তো পুরোপুরিই ভুল প্রমাণিত হবে কিন্তু সাবধান থাকতে ক্ষতি কি!

অরুণ চাপা গলায় বলল, তার মানে নীল টেম্পলের সঙ্গে ওদের যোগ আছে, এই কথা বলতে চাইছিস?

—বলতে চেয়ে তো লাভ নেই! কালই প্রমাণ পেয়ে যাব।

—কি ভাবে?

—কাল খুব ভোরে উঠেই আমাদের প্রথম কাজ হবে অপারেশন নীল টেম্পল।

অরুণ তাকিয়ে থাকে।

—ভোরে মানে বুঝতে পারছিস, ওরা দরজা খোলার আগেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

অরুণ মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

—আর একটা কথা, আমরা যে নীল টেম্পলের দিকে যাব, তা যেন মুংরুও টের না পায়। পুরো ব্যাপারটাই গোপন রাখতে হবে।

অরুণ এবারও মাথা নাড়ল, ঠিক আছে।

ততক্ষণে চা খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল ওদের। ব্রতীশ আবার সেই নীল টেম্পলের দিকটায় তাকাল, কিন্তু না, সেই আলোটা এখনো নিভে আছে। আশ্চর্য, এতক্ষণ আলোটার কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল ওরা। খুব আপশোষ হতে লাগল, আলোটার কথা ইন্দর সিংকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। সত্যি মিথ্যে যা হোক একটা উত্তর তো পাওয়া যেত।

—চল, ভেতরে যাই এবার। ব্রতীশ উঠে দাঁড়ায়।

অরুণও উঠে দাঁড়ায়, হ্যাঁ, ভেতরেই চল, ঠাণ্ডা লাগছে।

সারাটা দিন হুল্লোড়ের মধ্যে কেটেছে ওদের। ফলে বেশ ক্লান্ত। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই শুয়ে পড়ল ওরা।

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অরুণের। মনে হল, কেউ যেন বারান্দায় পায়চারি করছে। বারান্দাতেই, হ্যাঁ, স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওপাশে একবার ব্রতীশের বিছানার দিকে তাকাল, তাকিয়েই চমকে উঠল। ব্রতীশ নেই, বিছানাটা ফাঁকা। কম্বলটা অর্ধেক বিছানায়, অর্ধেক নিচে পড়ে গড়াচ্ছে। ব্রতীশ কি তবে বাথরুমে ঢুকল! কেমন সন্দেহ হল ওর।

এরপর আর শুয়ে থাকা চলে না। অরুণ লাফিয়ে উঠে বাথরুমের দিকে এগোল, দরজা ফাঁক করে দেখে নিল, না ব্রতীশ নেই। কোথায় গেল তাহলে! তবে কী বারান্দায় পায়চারি করছে ব্রতীশ! আর অপেক্ষা করা চলে না। তাড়াতাড়ি জামা কাপড় গায় চাপিয়ে ঘড়িটা হাতে গলাতে গলাতে বাইরে বেরিয়ে এল অরুণ।

ঘড়িতে এখন চারটে বত্রিশ। তার মানে ভোরই। কিন্তু বাইরে এখনো বেশ অন্ধকার আর তেমনি ঠাণ্ডা, সঙ্গে কুয়াশা।

দরজাটা বাইরে থেকে লক করে দিল। তারপর এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দেখল, না কেউ নেই। তাহলে যে পায়ের শব্দ শুনলাম সেটা কার! কেমন গোলোকধাঁধায় পড়ে গেল ও।

নির্ঘাৎ কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি ঘটতে পারে! ব্রতীশ বিছানা ছেড়ে বেরুবার সময় ডাকল না কেন ওকে! মনে মনে ভীষণ রাগও হচ্ছিল ওর। কিন্তু এখন রাগ প্রকাশের সময় নয়।

লনে নেমে বাংলোর পেছন দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসে অরুণ। দূরে আউট হাউসটা ঠাণ্ডায় যেন জমে আছে। দরজা টরজা সব বন্ধ। মুংরুকে ডাকবে কিনা একবার ভাবল। আর ঠিক এ সময় মনে হল, ওপাশে পাইন গাছের আড়ালে কে যেন চকিতেই নিজেকে আড়াল করছে। কে লোকটা!

অরুণ একটু থমকে দাঁড়াল। এরকম অবস্থায় খালি হাতে এগোনাটা উচিত কিনা বুঝতে পারল না। ফলে লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

কিছুক্ষণ পরেই, লোকটা আবার পাইনের আড়াল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটার হাতে একটা রুমালের মতো কাপড়। রুমালই বোধহয়। লোকটা সেই রুমাল নাড়তে নাড়তে চকিতেই সামনের ঢালের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

লোকটা রুমাল নাড়ল কেন! সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল অরুণের। তবে কী লোকটা ওকে আকারে ইঙ্গিতে ডাকল। যাই করুক, এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অরুণ আরো এগোল। বাংলোর লনের প্রায় শেষ সীমায় নেমে এল। সেই পাইন গাছটার কাছাকাছি আসতেই আরার ও দেখতে পেল লোকটাকে।

নাহ্, লোকটা বেশ খানিকটা নিচে নেমে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে আর রুমাল নাড়ছে।

এতক্ষণে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে এল অরুণের কাছে। নির্ঘাৎ ব্রতীশ।

ব্রতীশের আবছা ছায়া মূর্তিটা যেন ইশারায় কিছু বলতে চাইছে। অরুণ এক ছুটে নেমে এল আরো নিচে, একেবারে ব্রতীশেরই কাছে!

—কি আশ্চর্য, তুই এখানে! কি করছিস?

ব্রতীশ ঠোঁটে আঙুল চেপে ওকে কথা বলতে বারণ করল। তারপর কাছে টেনে নিয়ে ইরাশায় সামনের জঙ্গলের দিকে তাকাতে বলল।

অরুণ তাকাল। আবছা অন্ধকার আর কুয়াশা। কিছুই বোঝার উপায় নেই। তবু কুয়াশার মধ্যেই আরো বেশ খানিকটা নিচে কেউ যেন তরতর করে নেমে যাচ্ছে বলে মনে হল ওর।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল অরুণের। কে রে?

ব্রতীশ ফিসফিস করে বলল, চেনা যাচ্ছে না। ফলো করে দেখতে হবে কোথায় যায়।

—চিনিস না জানিস না, হঠাৎ ফলো করবি কেন? ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগে অরুণের।

—সে সব পরে বলব। তবে লোকটা সারারাত বাংলোয় কাটিয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

—বাংলোতে? কোথায়? কোন ঘরে?

—আমি যখন টের পেলাম, তখন ব্যাটার কাজকর্ম সব শেষ। বাংলো থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে শুরু করেছিল।

অরুণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, কিছুই বুঝতে পারছি না মাইরি। আচ্ছা, ইন্দর সিং নয়তো?

—ও ব্যাটার ঘর এখনো বন্ধ। রাতে দু'তিন বার উঠে আমি ওই ঘরের দিকে নজর রেখেছিলাম. সে সব পরে বলব তোকে, এখন সামনে পেছনে দু' দিকেই নজর রেখে এগোতে হবে। চল, এগো।

ওরা ধাপ ধাপ নেমে আবার একটা বড় গাছের আড়ালে চলে এল।

বহু নিচে লোকটাও মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছে আবার নেমে যাচ্ছে।

কিন্তু লোকটা সত্যি সত্যি যে কে বোঝার উপায় নেই। তবু ওকে চোখের আড়াল হতে দেওয়া চলে না। সাবধানে ওরা আরো খানিকটা এগোয়।

ব্রতীশ বলল, মনে হচ্ছে, নীল টেম্পলের দিকে যাতায়াত আছে লোকটার। নইলে ওদিকে যাচ্ছে কেন!

অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া অরুণের কিছুই বলার :নেই।

সামনে খানিকটা জায়গা একেবারে ফাঁকা মাঠের মতো। এ জায়গাটা চট করে দৌড়ে পেরন দরকার, নইলে চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

ব্রতীশ বলল, দাঁড়িয়ে না থেকে চল ছুটে পার হয়ে যাই। তারপর মাথা ঝুঁকে চোঁ করে পার হয়ে এল জায়গাটা। অরুণও অনুসরণ করল ওকে।

তারপর আবার জঙ্গল। পুরো জঙ্গলটাই কুয়াশায় ভেজা, যেন স্নান করা। কিন্তু ততক্ষণে জঙ্গলটা বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। অসংখ্য পাখির ডাক শুরু হয়ে গেছে চারপাশে।

—কোথায় গেল রে? প্রশ্ন করে অরুণ।

সামনে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নেই। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দূরের জিনিস দেখা সম্ভব নয়। ব্রতীশ গম্ভীর গলায় বলল, একেবারে অচেনা জায়গা বলেই পাখিটা বোধহয় পালাতে পারছে। চল, আরো এগিয়ে দেখা যাক। এই রাস্তা ধরেই ও গেছে।

আবার পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে ওরা। কিন্তু জঙ্গল যেন ক্রমশ আরো ঘন হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন কাঁটা গাছ যে ঘুরে এগোন ছাড়া উপায় নেই।

ততক্ষণে পিছন দিকের বাংলোটাও চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। চারপাশের জঙ্গল যেন ওদের ঘিরে ধরেছে।

অরুণ বলল, শেষটায় বিপদে পড়ে যাবো না তো? পেছনে কিন্তু বাংলোটাকেও দেখা যাচ্ছে না।

ব্রতীশ অরুণের পিঠের ওপর হাত রাখে, বিপদে পড়ার জন্যই তো এসেছি রে। নইলে কলকাতাতেই তো থাকতে পারতাম। চল চল, এগো।

আরো প্রায় মিনিট দশেক হাঁটল ওরা। তারপর আবার থমকে দাঁড়াতে হল, সামনেই বিরাট একটা খাদ। পাহাড়ের গায়ে যেন বিরাট একটা ধস নেমেছে। ফলে এখান দিয়ে নামা সম্ভব নয়। ওপাশ দিয়ে ঘুরে এগোতে হবে।

খাদের কাছাকাছি আসতেই বহু নিচে একটা পাহাড়ী স্রোতধারা চোখে পড়ে ওদের। বাইনোকুলারটা নিয়ে এলে ভাল করে দেখা যেত।

অরুণ বলল, ওই নালাটার কথাই বোধহয় ইন্দর সিংরা কাল বলেছিল।

—হতে পারে। ছোট্ট করে উত্তর দেয় ব্রতীশ। খাদটাকে এড়িয়ে নামবার জন্য তখনো লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছিল ও। আরো খানিকটা এগিয়ে ঘাস বোঝাই ঢেউ খাওয়া একটা ঢাল। মখমলের মতো দেখাচ্ছে।

ব্রতীশ বলল, চল, এই ঢাল ধরেই নেমে যাই। ঝোরার কাছাকাছি না পৌঁছতে পারলে কিছুই বোঝা যাবে না।

ঘাসের চারদিকে আতিপাতি করে চোখ বুলিয়ে নেয় ওরা। লোকটা যদি এখান দিয়ে নেমে থাকে, চিহ্ন চোখে পড়ত, কিন্তু কোন চিহ্নই ওদের চোখে পড়ল না।

লম্বা লম্বা ভেজা ঘাস। হাঁটু ডুবে যায়। কে জানে, এই ঘাসে জোঁক-টোক আছে কিনা। পাহাড়ী জোঁক বড্ড খারাপ। তবু ভয় পেলে চলবে না। তরতর করে ওরা নামতে থাকে। আরো খানিকটা নিচে হঠাৎ সরু মতো একটা রাস্তা চোখে পড়ল। হ্যাঁ, ওটা রাস্তাই মনে হচ্ছে।

রাস্তার কাছাকাছি আসতেই ব্রতীশ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

—কি হল? অরুণকেও দাঁড়াতে হল।

ব্রতীশ আঙ্গুল তুলে দেখাল, ঝোরার ওপাশ থেকে যে পাহাড়টা উঠে গেছে ওদিকে দেখ।

চমকে উঠল অরুণ। তাই তো সেই মানুষটাই। গায়ে কেমন আলখাল্লা পরা মনে হচ্ছে। কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে বড় বড় চাইয়ের আড়ালে।

—ইন্দর সিং না তো? অরুণ জিজ্ঞেস করে।

—মনে হয় না, ব্রতীশ বলল। কিন্তু কি খুঁজছে লোকটা!

মাঝে মাঝে বোল্ডালের আড়ালে চলে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পর পর ভেসে উঠছে। কেমন সন্দেহজনক ভঙ্গি।

ব্রতীশ ইঙ্গিত করল, বসে পড় অরুণ, ব্যাটা যেন দেখতে না পায়। যেন বুঝতে না পারে, আমরা ওকে ফলো করছি।

দু' জনেই একটা পাথর আড়াল করে ঝুঁকে রইল।

—কি করছে বলতো?

—যাই করুক, জায়গাটা খেয়াল রাখিস। দরকার হলে ও জায়গায় আমাদেরও যেতে হবে।

আরো অপেক্ষা করে ওরা। কিন্তু কিছুক্ষণ পর লোকটা যেন টুপ করে সত্যি সত্যি হারিয়ে গেল।

—কি হল রে? পাথরটার ওপাশে গিয়ে লোকটাও নিজেকে লুকোল নাকি?

কিছুই বোঝার উপায় নেই। কিন্তু মিনিট দশ পনের কেটে যাওয়ার পরও যখন আর দেখা যাচ্ছে না, তখন ব্রতীশই বলল, পাখি আবার উড়েছে। চল এগো। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই।

অরুণ খানিকটা কিন্তু কিন্তু করল, ব্রতীশ বলল, চল না। যদি দেখেই ফেলে, বলব, মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছি। চল।

আবার হাঁটা শুরু করে ওরা। ততক্ষণে পশ্চিম দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনা-গলা রং বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপূর্ব দৃশ্য।

চোখ ফেরান যায় না। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সময় ছিল না ওদের। তরতর করে ঝোরার দিকে নেমে যেতে থাকে ওরা।

মিনিট পনের সময় লাগল ঝোরার কাছে পৌঁছাতে। ঝোরা মানে, হাত তিরিশেক চওড়া একটা পাহাড়ী নদী, জলের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, অসম্ভব স্রোত। একটা মানুষকে এই স্রোত অনায়াসেই আছড়ে ফেলতে পারে। তবু ভরসা, নদীর বুকে বড় বড় বেশ কিছু বোল্ডার রয়েছে। ওর ওপর একটু সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঝোরাটা পার হওয়া যেতে পারে।

ব্রতীশ আর অপেক্ষা না করে একটা বড় পাথরে পা রাখে। অরুণের দিকে তাকিয়ে ডাকে, আয়। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

তারপর অনেক কায়দা কসরত করে কখনো লাফিয়ে কখনো পা টিপে টিপে ঝোরার ওপারে চলে আসে ওরা।

ওপার থেকেই শুরু হয়েছে চড়াই। চড়াই আর বিশাল বিশাল বোল্ডার তারই এপাশ-ওপাশ দিয়ে খানিকটা উপরে উঠে এসে ব্রতীশ একটা বড় পাথরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ঠিক এই জায়গা থেকেই লোকটা উবে গেছে, তাই না অরুণ?

অরুণের চোখে সন্দেহ, আর একটু উপরে বলে মনে হচ্ছে।

ওরা আরো একটু উপরে উঠল, কিন্তু না, এখান থেকে জ্যান্ত একটা মানুষের উবে যাওয়া অসম্ভব।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে ওরা। লোকটা ম্যাজিক-ফ্যাজিক জানে বলে মনে হচ্ছে। হাসে অরুণ।

আর ঠিক এ সময় এক ঝটকায় অরুণকে কাছে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিল ব্রতীশ, আড়ালে আয়। আড়ালে।

একটা পাথরের আড়ালে চলে এল ওরা। বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

ব্রতীশ বলল, নিচে ওই ঝোরার দিকে তাকিয়ে দেখ। ইন্দরের বউটার মতো মনে হচ্ছে।

সত্যিই তাই। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অরুণও। আমাদের দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে। কি নাম যেন ওর?

ব্রতীশ বলল, রেখা। দেখেছে বলে মনে হয় না। সরে আয়, ওই বড় পাথরটার পেছনে লুকোলে দেখতে পাবে না।

প্রায় বুকে হেঁটে খানিকটা পিছিয়ে এসে ওরা একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে এল। জায়গাটা নিরাপদ। তাছাড়া এখান থেকে নীল ঝোরাটাকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। ওপাশে যেখান থেকে সেই লোকটা গায়েব হয়ে গেছে, সেদিকটারও অনেকখানি দেখা যাচ্ছে।

ততক্ষণে মেয়েটা নীলঝোরার উপরে এসে পড়েছে। পরনে শাড়ি, আঁটোসাঁটো করে আঁচলটা গায়ে জড়ান। পায়ে সম্ভবত কেডস। এতদূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় না।

তাকিয়ে থাকে ওরা। রেখা কি একাই বেরিয়েছে নাকি ইন্দর সিংও সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু কোথায় ইন্দর সিং, মেয়েটা ছাড়া কেউই নেই।

অরুণ বলল, তার মানে ওরাও কোন একটা ধান্দায় ঘুরছে।

—সন্দেহ আছে নাকি! ব্রতীশ ফিসফিস করে বলল, ওরাও নীল টেম্পলের জন্যই এখানে এসে পড়ে আছে।

—নীল টেম্পলে ওরা কি করবে?

—যা করবার জন্য আমরা এসেছি। যাক, ও-সব কথা পরে হবে। ওদিকে লক্ষ্য রাখ এখন।

—আবার ঝোরার দিকে তাকায় অরুণ। রেখা ততক্ষণে ঝোরাটা পার হয়ে এসেছে। পার হয়ে এক পলক দাঁড়িয়েছে। তারপর ওরা যা আশা করেছিল তাই হল, রেখাও বাঁদিকের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

ব্রতীশ বলল, চোখে চোখে রাখিস অরুণ। কোথায় যায় ভালভাবে নজর রাখতে হবে। নইলে পরে পস্তাতে হবে কিন্তু।

দেখা গেল, রেখাও পাথরে ভর রেখে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু ক্রমশ যেন আরো বাঁদিকে সরে যাচ্ছে।

অরুণ বলল, চল, ওই সামনের পাথরটার আড়ালে চলে যাই। এখান থেকে একটু পরেই কিন্তু ওকে আর দেখা যাবে না।

ব্রতীশ বলল, তুই এগিয়ে যা। আমি নিচের দিক দিয়ে এগোই। মনে রাখিস, ইন্দর সিংটাও কিন্তু হঠাৎ এসে হাজির হতে পারে।

আবার বুকে হেঁটে সামনের দিকে আর একটা পাথরের আড়ালে চলে এল অরুণ। ব্রতীশও চকিতে নিচের দিকে নেমে নিজেকে আড়াল করল।

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল ওরা। ওপাশে মেয়েটা তখনো ঝুঁকে ঝুঁকে উঠছে। একটু হাঁপিয়ে পড়েছে বোধহয়। উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে নেয় অরুণ। ব্রতীশটা আরো কতটা সরে গেল বোঝা গেল না। অরুণ লক্ষ্য করার চেষ্টা করল ওকেও, কিন্তু না, বড় বড পাথরের চাইয়ের আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে ব্রতীশও।

এক পলক কি ভাবল অরুণ, তারপর আরো একটা বড় পাথরের আড়ালে বুকে হেঁটে এগিয়ে এল। মেয়েটা আবার উঠতে শুরু করেছে। এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। ফলে, আর নাড়াচড়া করতে সাহস পেল না ও।

আরো খানিকটা উপরে উঠলেই বনতুলসীর জঙ্গল। ওই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে না কি মেয়েটা! সর্বনাশ, তাহলে তো কোমর উঁচু ওই জঙ্গলে হারিয়ে যাবে ও। অরুণ কি যে করবে বুঝতে পারল না। ব্রতীশও কাছছাড়া হয়ে গেছে। শব্দ করে যে ওকে ডাকবে তারও উপায় নেই।

শেষপর্যন্ত মরীয়া হয়ে চকিতে একবারে জঙ্গলের কাছাকাছি এগিয়ে এসে আবার একটা পাথরের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ল অরুণ। যা ভেবেছিল তাই, মেয়েটা জঙ্গলের দিকেই এগোচ্ছে।

হ্যাঁ, জঙ্গলের গায় গায় এসে কোমর বাঁকা করে জঙ্গলের ভেতরেই ঢুকে পড়ল।

যাহ্ বাবা, এবার! ওরও কি জঙ্গলে ঢোকা উচিত! কিন্তু না, তাতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। জঙ্গলের ভিতর ঢুকলেই শব্দ হবে। তাছাড়া জঙ্গল নড়তে শুরু করলেই ওদিক থেকে সন্দেহ জাগবে। বরং আরো একটু অপেক্ষা করা ভালো। যতদূর সম্ভব ঘাড় উঁচু করে রেখার অস্তিত্ব বোঝার চেষ্টা করতে থাকে অরুণ।

রেখা অমন কুঁজো না হয়ে যদি সোজা হয়ে ঢুকত, তাহলে অনায়াসেই ওকে দেখা যেত। তবে কি ও জঙ্গলে ঢুকে নিজেকে গোপন রাখতে চায়। কি আছে তাহলে ওই জঙ্গলে!

ওই তো ওদিকটা কাঁপছে। অরুণ এবার হঠাৎ রেখার পিঠের দিকটাও দেখতে পেল। ওই তো, ওই তো এগিয়ে যাচ্ছে রেখা। কোথায় যাচ্ছে ও!

আর একটা পাথরের পিছনে এগিয়ে এল অরুণ। এমন সময় চোখে পড়ল ব্রতীশকে। হাত তিরিশকে দূরে ব্রতীশ একটা পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে ওর চোখেও সন্দেহ।

অরুণ ইশারা করল, তারপর হাত নেড়ে জঙ্গলের দিকটা দেখিয়ে দিল।

ব্রতীশও হাত তুলে নজর রাখতে বলল অরুণকে। তারপর পাথর ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে একেবারে জঙ্গলের কাছাকাছি এগিয়ে এল ওরা।

অরুণ দেখল, ঝোপের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় রেখা হঠাৎ যেন টপ করে ডুবে গেল। ঝোপের কাঁপুনিও বন্ধ হয়ে গেল। সম্পূর্ণভাবে চোখের আড়ালে চলে গেল মেয়েটা।

শক্ত হয়ে দাঁড়াল অরুণ। সামনে কোমর উঁচু বনতুলসী ছাড়া আর কিছুই নেই। এতক্ষণ তবু একটু আধটু দেখা যাচ্ছিল রেখাকে। কিন্তু এখন! এ অবস্থায় আর একটু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অন্তত আবার মেয়েটা জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে ওঠে কিনা তা লক্ষ্য করা ছাড়া উপায়ই বা কি।

কিন্তু না, বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল, রেখার আর পাত্তাই নেই। আশ্চর্য, জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে কি করছে মেয়েটা। জঙ্গলও এমন স্থির, যেন এক চুলও নড়ছে না।

আরো কিছু সময় কেটে গেল। অরুণ বুঝতে পারছে না কি করবে। ব্রতীশের কাছাকাছি এগিয়ে গেলে হয়। কিন্তু ব্রতীশেরও কোন সাড়াশব্দ নেই। আশ্চর্য, গেলো কোথায় সব!

হঠাৎ মনে হল, ওপাশের বনতুলসী আবার যেন কিছুটা কেঁপে উঠেছে। অরুণ আবার নিজেকে আড়াল করার জন্য বসে পড়ল।

হ্যাঁ। ঝোপের ভিতর দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে কেউ যেন এগোচ্ছে। রেখাই কি! না, রেখা হতে পারে না। রেখা যেখানে উধাও হয়েছে সেই জায়গার দিকেই কেউ যেন এগোচ্ছে। তবে কি ব্রতীশ, ব্রতীশই বোধহয় ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আবার উঠে দাঁড়ায় অরুণ। আর এ সময় নিশ্চিন্ত হয়, ব্রতীশই। ওই তো ওর জামা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রতীশই ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। অরুণও আর অপেক্ষা করে না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে অরুণও।

বুনো গন্ধ। তেমনি খোঁচা খোঁচা ডালপালা। পা ছড়ে যাওযার ভয়। কিন্তু উপায় নেই, এগোতেই হবে। এগোতে থাকে অরুণ। মাঝে মাঝে একটু করে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ব্রতীশকে নজর রাখার চেষ্টা করে। হঠাৎ মনে হল, ব্রতীশ টানটান হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ঠিক যেখানটায় রেখা উধাও হয়েছিল সেখানটায়। দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে।

অরুণ বুঝল, কিছু একটা ঘটেছে। ব্রতীশের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ইশারা করে অরুণ।

ব্রতীশ চাপা গলায় ডাকল, তাড়াতাড়ি আয়, পেয়ে গেছি।

কি পেয়ে গেছে ব্রতীশ! অরুণ কেমন অবাক হল, তারপর জঙ্গলের উপর দিয়ে যেন সাঁতরে সাঁতরে চলে এল ব্রতীশের কাছে।

—কি? কি হয়েছে?

ব্রতীশ মুখে হাত চাপল, কথা নয়। এই দেখ, এখান দিয়ে একটা স্থড়ঙ্গ নেমে গেছে।

—স্থড়ঙ্গ! প্রথমটায় বুঝতে পারে নি অরুণ। পরে অবাক হয়ে দেখল, সত্যি সত্যি একটা স্থড়ঙ্গ। মুখে এক গাদা জঙ্গল জমিয়ে রাখা। চট করে বাইরে থেকে কারো পক্ষেই বোঝার উপায় নেই।

—তাইতো! তাহলে স্থড়ঙ্গে ঢুকেছে বলতে চাস? সেই রহস্যময় লোকটাও এখানে এসে যে হারিয়ে গিয়েছিল, এই স্থড়ঙ্গেই ঢুকেছে তাহলে?

—নইলে আর কোথায়ই বা যেতে পারে। হঠাৎ এখানে এসে যে মিলিয়ে যাচ্ছে, তার আর কিইবা কারণ থাকতে পারে!

—ঢুকবি? প্রশ্ন করে অরুণ।

ব্রতীশ ততক্ষণে স্থড়ঙ্গের মুখ থেকে গাছপালার জঞ্জাল খানিকটা ফাঁক করে ভিতরে চোখ পাতার চেষ্টা করল। পাথর-কাটা থাক থাক সিঁড়ির মতো নেমে গেছে বলে মনে হল। কিন্তু খানিকটা পরেই স্থড়ঙ্গটা বাঁক নেওয়ায় আর তেমন কিছুই দেখা যায় না।

—চল, নেমে তো পড়ি। সাবধানে নামবি কিন্তু। বলতে বলতে টুপ করে নেমে পড়ল ব্রতীশ।

অরুণের পক্ষেও আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। নেমে পড়ল অরুণও।

খানিকটা নামার পর কেমন এক অন্ধকার ঘিরে ধরল ওদের। স্থড়ঙ্গটা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতিভাবে বাঁক নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে বলে মনে হল। এই অন্ধকার স্থড়ঙ্গের দেয়ালে হাত রেখে ধীরে পায়ের নিচে পাথর বা মাটি অনুমান করে এগোন ছাড়া উপায় নেই।

ব্রতীশ ফিসফিস করে বলল, সাবধানে আয়। দেয়ালে হাতের ভর রেখে রেখে এগো। সাবধান।

অরুণের মনে হল, সুড়ঙ্গের ভেতরে কেমন যেন গুমোট গরম। অথচ বাইরে কী কনকনে ঠাণ্ডা। পাহাড় সম্পর্কে অরুণের অভিজ্ঞতা খুবই কম। তাছাড়া সুড়ঙ্গে ঢোকা ওর জীবনে এই বুঝি প্রথম।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ওরা পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকে। কতক্ষণ যে হাঁটল, হিসেব ছিল না। হঠাৎ মনে হল, সামনের দিকে এক চিলতে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

ব্রতীশ সামনে সামনে এগোচ্ছিল, একটু দাঁড়াল।

অরুণও দাঁড়াল, কি হল ?

—কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছিস ?

—শব্দ ! অরুণ কান পেতে অপেক্ষা করে ? কিন্তু না, তেমন কিছুই কানে এল না ওর।

ব্রতীশ ফিসফিস করে বলল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কেউ যেন ওই সামনের দিকে হঠাৎ সরে গেল।

আলোর রেখাটা এমন কিছু বেশি নয়। আর একটু না এগোলে রহস্যটা বোঝা যাবে না। কিন্তু ব্রতীশ যতক্ষণ না এগোতে বলছে ততক্ষণ এগোন যায় না।

—নাহ্, ব্রতীশ বলল, চল আবার এগোই। যা থাকে কপালে হয়ে যাক।

আবার সাবধানে এগোতে থাকে ওরা।

কয়েক পা এগোতেই রহস্যটা বোঝা গেল। পাহাড়ের গায় সুড়ঙ্গের মধ্যে ছোট্ট একটু ফাটল। সেখান দিয়ে সরু সুতোর মতো অল্প অল্প জল গড়িয়ে নামছে। আর একপাশে একটা ফুটোর মতো। তারই ভিতর দিয়ে খোলা আকাশের কিছুটা আলো সুড়ঙ্গের মধ্যে এসে পড়েছে।

—তাহলে কি জলের শব্দই শুনে ছিলাম! ব্রতীশ অরুণের দিকে তাকায়।

অরুণ বলল, হতেও পারে। কিংবা হয়তো কোন পাথর-টাথর গড়িয়ে পড়েছিল।

সুড়ঙ্গের মধ্যে জল পড়ে পড়ে জায়গাটা বেশ পেছল হয়ে রয়েছে বলে মনে হল ওদের। কিন্তু এখন আর না এগিয়ে পথ কোথায়! ব্রতীশ পা চেপে চেপে আবার এগোতে থাকে। দেয়ালে হাতের চাপ না রাখলে সত্যি সত্যি পিছলে পড়ার ভয়। দেয়াল ধরে ধরে এগোতে থাকে ওরা।

পনের কুড়ি পা এগোবার পর আবার থমকে দাঁড়াতে হল। সুড়ঙ্গটা দু'মুখো হয়েছে এবার। বাঁ দিকের থাক থাক সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। আর ডান দিকটা ঠিক আগের মতো সোজা এগিয়ে গেছে বলে মনে হল ওদের।

—ঝামেলা হল তো! ব্রতীশ অরুণের দিকে তাকায়, কোনটা ধরব এবার?

অরুণ আমতা আমতা করে, আগে বাঁ দিকেই এগিয়ে দেখি না, কোথায় উঠেছে দেখা যাক।

—ঠিক আছে, তাই চল।

বাঁ দিকের খাঁজ-কাটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে ওরা। কিছুটা উঠতেই আবার সামনের দিকে অল্প আলোর আভাষ। মনে হল, সামনে আরো কিছুটা এগোলেই হয়তো আবার একটা ফাটল চোখে পড়বে।

অরুণ ফিসফিস করে বলল, চল না এগোই। এগোলেই বোঝা যাবে, ফাটল না আর কিছু। এগোতে থাকে ওরা।

আলোর কাছাকাছি এগিয়ে এসে দু'জনেই এবার বোকা বনে গেল। ফাটল কোথায় এতো সুড়ঙ্গের শেষ। আর সেই শেষ অংশে একটা পাথর দিয়ে মুখটাকে ঢেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পাথরের

ফাঁক দিয়েই ওপরের খোল। আকাশখানার সামান্য একটু দেখা যাচ্ছে।

—এবার? প্রশ্ন করে অরুণ।

ব্রতীশ বলল, পাথরটা সরিয়ে ফেলতে পারলে কিন্তু ওপরে ওঠা যেতে পারে। কিন্তু এত বড় পাথর কি সরানো সোজা!

পাথরে হাত রেখে দু'একবার চাড় মারল ওরা, অসম্ভব।

কেমন হতাশ চোখে তাকাল অরুণ। মনে হচ্ছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে ওরা যেন বন্দী হয়ে পড়েছে। কেউ কি টের পেয়ে গেছে, ওরা সুড়ঙ্গের ভিতরে! কেমন সন্দেহ হয় ওর।

—আমার ধারণা ওরা নির্ঘাৎ টের পেয়েছে।

ব্রতীশ দমবার পাত্র নয়। বলল, তাহলে বলতে হয়, বেশ ঝামেলার মধ্যেই আমরা জড়িয়েই পড়েছি। পাথরের এই ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরেব কিছু দেখতে পারিস কিনা দেখবি? আমি তোকে পেছন থেকে খানিকটা তুলে ধরছি।

অরুণ বলল, ঠিক আছে তাই ধর। বলতে বলতে অরুণ পাথরের গায়ে পা দিয়ে নিজের দেহটা শূন্যে তুলে ধরার চেষ্টা করে। ব্রতীশ ওকে ওপরে উঠতে সাহায্য করে।

পাথরের সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় অরুণ। তাকিয়েই কেমন অবাক হয়ে যায়। পার্ক সার্কাসের বার্মিজ ভিলায় সেদিন রাতে যে নীল টেম্পলের মডেল দেখেছিল ও, সেই দৃশ্য। হুবহু এক।

—কিছু দেখতে পাচ্ছিস? নিচ থেকে জিজ্ঞেস করে ব্রতীশ।

অরুণ বলল, নীল টেম্পল।

—কি নীল টেম্পল?

অরুণ চোখ না সরিয়েই বলল, শ' পাঁচেক হাত দূরে সেই মাথা ভাঙা পাহাড়ের ঢিবিটা দেখা যাচ্ছে। হুবহু নীল টেম্পলের যে মডেল দেখেছিলাম, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

—আর কিছু ?

—বাইরে বেশ ঝলমলে রোদ উঠেছে। পাখি-টাখি উড়ছে।

—কোন মানুষ ?

—না কেউ নেই।

—ঠিক আছে, তুই নাম। আমি খানিকটা দেখি।

অরুণ নেমে দাঁড়ায়। ব্রতীশ বলে, কোমরে চাপ রাখিস। এরপর অরুণের মতো পাথরে পা রেখে ব্রতীশও উঠে দাঁড়ায়।

পাথরের ফাঁক দিয়ে ব্রতীশ দেখল, সামনেই খানিকটা দূরে একটা মাথা-ভাঙা পাহাড়। টিলা পাহাড় গোছের। মাথার দিকটা যেন ধস ভেঙে পড়ে গিয়ে ও-রকম হয়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ পাহাড়টাই ন্যাড়া। ঘাস ছাড়া একটা বড় গাছও সেখানে নেই।

মাথা ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখার চেষ্টা করে ব্রতীশ, কিন্তু বার দুয়েক পাথরে মাথা ঠুকে গেল ওর।

—নাহ্, নেমে দাঁড়ায় ব্রতীশ।

—কি করবি এবার? চল ফিরে যাই। অরুণ কেমন অসহায় ভঙ্গি করে তাকায়।

ব্রতীশ হাসে, এতদূর যখন এসেছি তখন ফেরার কোন মানেই হয় না। সেই আলখাল্লা পরা লোকটা আর ইন্দর সিংয়ের বাঙালী বউ রেখাকে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। চল নামি আবার, ও-পাশের সুড়ঙ্গটা দেখে নেওয়া যাক।

আবার ওরা নিচে নেমে এল। ও-পাশের সুড়ঙ্গ যেন আরো অন্ধকার। তা হোক, পাথরের গায় হাত রেখে রেখে এগোতে ওরা অভ্যস্থ হয়ে গেছে। ব্রতীশ বলল, আয়, পেছনে আয়।

এগোতে শুরু করে ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ এক সময় দু'জনেই কেমন চমকে ওঠে। সামনেই মনে হল গুহাটার শেষ। আর সেই শেষ

প্রান্ত থেকে একটা পাথরের দেয়াল যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। বাইরের আলো এসে সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকছে।

মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে ওরা, তারপর মিনিট ছ'তিনেকের নিরবতা। গুহার মুখটা এখন খোলা, কিন্তু বাইরের কিছুই চোখে পড়ার উপায় নেই। কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে ওদিকটা।

হঠাৎ গুহার খোলা মুখের দিক থেকে একটা ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ফের পিছু নিয়েছিস?

গলার স্বর ভীষণ ভারি, না, ইন্দর সিংয়ের গলা এরকম নয় তবে কে ও!

আবার গলার স্বর, যদি বাঁচতে চাস, এখনো সময় আছে, ফিরে যা বলছি। গুহার ভিতর গমগম করে উঠল শব্দটা।

তারপর আবার স্তব্ধতা। আবার দু-তিন মিনিট কেটে গেল। এমন সময় আশ্চর্য, পাথরের সেই দেয়ালটা ধীরে ধীরে আবার সুড়ঙ্গের মুখে এসে চাপা পড়ে গেল।

—কি রকম হল! অত বড় একটা ভারি পাথর কি লোকটা একা একাই ঠেলে গুহার মুখ বন্ধ করল।

ব্রতীশ চকিতে ছুটে এল বন্ধ মুখের কাছে। অরুণও। তারপর পাথরের গায় হাত রেখে বুঝল, অসম্ভব! কোন কৌশল ছাড়া এ পাথর সরানো সম্ভব নয়। কিন্তু কি সেই কৌশল!

অরুণ বলল, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস ব্রতীশ, এখানে দেয়ালটা কি মসৃণ! যেন সিমেণ্ট দিয়ে প্লাস্টার করা।

দেয়ালটা যে মসৃণ, তা ব্রতীশেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু এখন মুখ-ঢাকা পাথরটা নিয়েই ওর চিন্তা। নির্ঘাৎ কোন কৌশল রয়েছে পাথরটা সরাবার। কৌশলটা ওদের যেভাবেই হোক জেনে নিতে হবে।

পাথরটাকে আরো বার কয়েক ওরা ধাক্কাধাক্কি করল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! হঠাৎ আবার স্থির হয়ে গেল ওরা। মনে হল, সুড়ঙ্গের

ভিতর দিয়ে কেউ যেন ওদের দিকেই আসছে। মুখ চাওয়া-চাইয়ি করল। ভুল শুনছি না তো শব্দটা। না, দ্রুত পায় কেউ যেন এগিয়েই আসছে। বুকের ভেতর ঢিবঢিব করে উঠল অরুণের।

ব্রতীশ বলল, বসে পড়। একটু পেছিয়ে এসে বসে পড়।

চকিতেই ওরা তিন-চার পা পেছিয়ে এসে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গুটিয়ে বসে পড়ল। বসে কান পেতে রইল শব্দটার দিকে।

কিন্তু না, শব্দটা আবার থেমে গেছে। কেউ যেন এগোতে এগোতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে।

অরুণ ফিসফিস করে বলল, একেবারে খালি হাতে আসাটা ঠিক হয় নি আমাদের।

ব্রতীশ অরুণের পিঠে হাত রাখে, ভয় নেই, সঙ্গে মেসিন রয়েছে। অরুণের একটা হাত টেনে এনে ব্রতীশ রিভলবারটাকে ছুঁইয়ে দেয়।

অরুণ অবাক হয়ে গেল, এই জন্যেই তোকে গুরু ডাকি রে। লোড করা আছে তো?

কিন্তু উত্তর দেওয়া হল না। আবার শব্দ। থমকে থাকা লোকটা যেন আবার এগোচ্ছে। অপেক্ষা করে রইল ওরা।

শব্দটা ভারি হয়ে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। অরুণ মাটি থেকে একটা ধারালো পাথরের টুকরো হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। একেবারে খালি হাতে থাকার চে' এটা মন্দ নয়।

অবশেষে আবছা একটা ছায়া মূর্তি। অন্ধকারে স্পষ্ট করে চিনবার উপায় নেই। মূর্তিটা ব্রতীশদের সামনে দিয়েই টলতে টলতে এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের সেই মুখটায়। এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি করছে ওখানে! কে ও! ব্রতীশ মরীয়া হয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। অরুণও।

অন্ধকারের জন্য কিছুই বোঝার উপায় নেই। লোকটা কী ওখানে সত্যিসত্যি থমকে দাঁড়িয়ে আছে!

রুদ্ধশ্বাস কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল ওরা।

অবশেষে আবার সেই পাথরের ঢাকনাটা নড়ে উঠল। হ্যাঁ, খানিকটা আলো এসে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল আবার। আর সেই আলোয় ওরা চিনতে পারল মূর্তিটাকে, আশ্চর্য, রেখাদেবী! শাড়ির আঁচলটা কোমরে অদ্ভুতভাবে জড়ান।

রুদ্ধশ্বাস অপলক তাকিয়ে রইল ওরা। রেখা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেয়ালের দিকে কি যেন একটা চেপে ধরেছে, আর পাথরের ঢাকনাটা আবার ধীরে ধীরে সরে গিয়ে মুখটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

পাথরটাকে সরানোর কায়দাটা যেন চোখের ওপর ভেসে উঠছে ওদের।

হঠাৎ নাটকীয় একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসল ব্রতীশ। চিৎকার করে উঠল, সাবধান, এক পাও নড়বেন না বলছি।

চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল রেখা। দু'চোখে কেমন বিস্ময়। ঘোরটা কাটিয়ে নিতে একটুখানি সময় লাগল ওর। পর মুহূর্তেই মিষ্টি করে হেসে উঠল, আপনারা?

—হ্যাঁ আমরা। নড়বার চেষ্টা করবেন না।

রিভলবারটা তুলে অদ্ভুত কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রতীশ। ওদিকে গুহার মুখটা তখনো হাঁ করে খোলা। কি রয়েছে গুহার বাইরে কে জানে!

—ইন্দরবাবু কোথায়? জিজ্ঞেস করল ব্রতীশ।

রেখার মুখ দিয়ে উত্তর বেরুল না

ব্রতীশ দু'পা এগিয়ে এল, কোথায় ইন্দর সিং? যা জানতে চাইছি, জবাব দিন।

—ও আসে নি। বাংলোতেই আছে। কিন্তু আপনারা কিভাবে এলেন এখানে?

—আপনারা যে ভাবে এসেছেন। দাঁত চেপে উত্তর দিল ব্রতীশ। টেম্পলে ঢুকবার পথ কি এটাই?

রেখা শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপর টেনে নিল, কেন, চেনেন না ?

—চিনে নিতে অবশ্য সময় লাগবে না ? তবু যা প্রশ্ন করছি, জবাব দিন।

রেখাদেবীর ঠোঁটে অল্প একটু হাসির ঝলক, হ্যাঁ, এটাই টেম্পলের পথ।

—তবে পাথরের দেয়াল সরিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন ?

—যাবেন আপনারা ? চলুন না, এক সঙ্গেই বেরুই, বেরুলেই দেখতে পাবেন।

—না। দৃঢ় গলায় জবাব দিল ব্রতীশ। তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, তুই একবার বাইরে বেরিয়ে দেখে নে অরুণ। সাবধান।

—তার মানে আমাকে বিশ্বাস করেছেন না ?

অরুণ ততক্ষণে লাফিয়ে খোলা গুহার মুখের কাছে এগিয়ে এসেছে। তারপর পাথরের দেয়াল ধরে গুহার ভেতর থেকে উপরের দিকে তাকায় অরুণ।

উপরে খোলা আকাশ। আর সামনেই বিরাট বিরাট বেশ কিছু পাথরের সারি। নীল টেম্পলের মাথা-ভাঙা পাহাড়টাও যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

রেখার সামনে ব্রতীশ তখনো পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে। অরুণ আবার নিচে নেমে এল, নীল টেম্পলের চৌহদ্দির মধ্যেই ঢুকে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে রে। সামনেই সেই নীল টেম্পলের মাথা-ভাঙা পাহাড়।

—তার মানে নীল টেম্পলে আপনারা সত্যি সত্যি নতুন। রেখা সামান্য একটু হাসল। কিন্তু কি দেখতে এসেছেন এখানে ?

—প্রশ্নটা আমরাও আপনাকে করতে পারি, আপনি আর আপনার হাজব্যাণ্ড রোজ এখানে এসে কি করেন ? কি দেখে বেড়ান ?

—কি করি শুনবেন ? হাতের ওটা সরান, বলছি।

—ঠিক আছে বলুন। ব্রতীশ রিভলবারটা মাটির দিকে ঝুলিয়ে রাখে।

—রাজাবাবুর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। রাজাবাবু তার স্ত্রীর মৃত দেহ এই টেম্পলের ভেতরে সযত্নে রেখে দিয়েছেন। এক বছর ধরে ওই দেহটা মিশরের মমির মতো নাকি অটুট রয়েছে। কার না তা দেখে যেতে ইচ্ছে হয় বলুন।

—রাণীমার দেহটা রেখে দেওয়া আছে বলে আমারও শুনেছি। কোথায় সেটা ?

—কোথায় যে, তা আমিও খুঁজে বেড়াচ্ছি।

—মানে ?

—মানে বুঝতে হলে আমার সঙ্গে চলুন, আপনাদের দেখিয়ে আনি।

—কোথায় ? কি দেখাবেন ?

—রাণীমাকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেই জায়গাটা যদি দেখতে চান, চলুন। এখন শুধু সেখানে বেদিটাই দেখতে পাবেন, রাণীমা নেই। যাবেন ? চলুন না ?

—নেই মানে ! অরুণ আর ব্রতীশ মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে।

—কিছুদিন আগে রাজাবাবু তাকে সরিয়ে অন্য কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন। কেউ কেউ বলে, রাজাবাবু বডিটাকে পুড়িয়ে ফেলেছেন।

—অসম্ভব, হতেই পারে না। তা ছাড়া আমরা শুনেছি, এক বছরের ওপর রাজাবাবু নিখোঁজ হয়ে আছেন। কারো কারো মতে তিনি আর বেঁচে নেই।

—নিশ্চয়ই সুন্দরগাঁয়ে শুনেছেন ?

—যেখানেই শুনি, কথাটা সত্যি না মিথ্যে ?

—ডাঁহা মিথ্যে। রাজাবাবুর সঙ্গে কালও আমাদের দেখা হয়েছে। কেমন পাগলাটে ধরনের মানুষ, কিছুতেই ধরা দিতে চান না।

—কোথায় দেখা হল ?

—এই গুহার বাইরে। এক পলকের জন্য দেখা। আবার চকিতেই উনি চোখের বাইরে মিলিয়ে গেলেন। রাণীমাকে একটু দেখার জন্য যত ওঁকে বোঝাতে যাই, উনি আরো ক্ষেপে যান।

রেখাদেবী সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে, বোঝার উপায় নেই। তখন যে আলখাল্লা পরা মানুষটাকে বাংলোর চত্বর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল সেই কি তবে রাজাবাবু! অসম্ভব নয়, হতেও পারে।

ব্রতীশ শুধাল, রাজাবাবুর পরনে কি আলখাল্লার মতো পোষাক থাকে ?

—কেন বলুন তো ? আপনারাও দেখেছন নাকি ?

—ওই রকম একটা মানুষকে আমরাও আজ এই গুহায় ঢুকতে দেখেছি। আমাদের সন্দেহ, লোকটা এখান দিয়েই বেরিয়ে গেছে।

—ঠিকই দেখেছেন। এই নীল টেম্পলে এ রকম অনেকগুলো গুহা, কোনটা ছোট, কোনটা বড়। আসুন না, আমরা বাইরে বেরুই। বেরুলেই অনেক জিনিস পরিস্কার হয়ে যাবে।

অরুণ আর ব্রতীশ আবার মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে। পরে ব্রতীশই বলে, ঠিক আছে, চলুন।

রেখা ওপরে ওঠার জন্য পাথরের ওপর পা রাখতেই ব্রতীশ রিভলবারটা ওর পিঠের সঙ্গে একটু ছুঁইয়ে ধরে। আগে আমাদের কাউকে উঠতে দিন। পরে আপনি।

রেখা আবার গুটিয়ে গেল, ঠিক আছে কে উঠবেন উঠুন।

ব্রতীশ ইশারা করল অরুণকে। অরুণ পাথর বেয়ে বেয়ে উন্মুক্ত গুহার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্রতীশ বলল, এবার আপনি উঠুন।

রেখা ব্রতীশের দিকে একবার তাকাল, তারপর খুব স্বাভাবিক ভাবেই উপরে উঠে এল। পেছন পেছন ব্রতীশও।

বাইরে বেরুতেই ঝলমলে আকাশ চোখের ওপর ভেসে উঠল ওদের। সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা বহু দূর ছড়ানো পাহাড়ের ঢল। কাঞ্চনজঙ্ঘাটা এখন বোধহয় পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে।

ওদের মনে হল, পাহাড়ের মাথায় একটা সমতল জমির ওপর যেন এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। ওদিকে নেমে গেছে বহুদূর অবধি ঢাল, সেই ঢালের শেষ প্রান্তে ক্ষীণকায়া সেই পাহাড়ী ঝোরাটা সুতোর মতো দেখা যাচ্ছে।

রেখা বলল, ওই যে সামনের দিকে মাথাভাঙা টিলাটা দেখছেন, ওটাই নীল টেম্পল। ওর ভেতরে রাজা বিম্বিসারের বিরাট এক সৌধ চাপা পড়ে আছে। সে সব এখন আর দেখার উপায় নেই, তবে খানিকটা এগোলে আর একটা গুহা পাবেন, তার ভেতরে আমরা অনেকবার ঢুকেছি।

—কি আছে ওখানে?

রেখা দু'পা এগিয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল, ওই গুহার মধ্যেই বিশাল একটা হল ঘরের মতো জায়গায় রাণীমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল. সেই বেদিটা এখনো আছে, কিন্তু রাণীমার দেহটা রাজাবাবু সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

—কোথায় রেখেছেন?

—সেটা জানার জন্যই তো নীল বাংলো ছেড়ে যেতে পারছি না অরুণবাবু। আর সে জন্যই তো রোজ এখানে এসে ঘুরে মরছি।

—হেঁয়ালি করবেন না। আমার নাম জানলেন কি করে?

—বারে, কালই তো আপনারা পরিচয় দিলেন। আমরা কাল এই টেম্পলের কাছ থেকেই ফিরতে ফিরতে রাত করে ফেলেছিলাম। আপনারা তখন কেমন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে ছিলেন আমাদের দিকে।

ব্রতীশ ততক্ষণে রিভলবারটা আবার পকেটে ভরে নিয়েছে। প্রকাশ্য দিনের আলোয় ওটাকে লুকিয়ে রাখাই ভাল।

রেখা হাসল, একটা কথা বলব ?

ওরা তাকিয়ে রইল।

—কাল কিন্তু সত্যি সত্যি এ-সব কথা আপনাদের কাছে গোপন রাখতেই চেয়েছিলাম।

—কেন ?

—প্রথম আলাপেই এ·সব বলাটা কি ভালো! তা ছাড়া আপনারা তখন বিশ্বাসও করতেন না। আমরা একটা মৃতদেহ দেখার জন্য ঘুরে মরছি এ কথা বললে আপনারা হাসতেন।

ব্রতীশ বলল, আপনাদের চা অফার করেছিলাম, আপনারা এড়িয়ে নিজেদের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

—তাও এ জন্যই। রেখা আবার খুব সহজ ভঙ্গিতে হাসে।

অরুণ বলল, কাল রাতে আমরা বাংলোয় বসে এই নীল টেম্পলের দিক থেকে মাঝে মাঝে আলো জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম। আলোটা কেবল জ্বলছিল আবার. নিভছিল। আমরা ওই আলো দেখেই সন্দেহের মধ্যে পড়েছিলাম।

—আমরা যখন প্রথম আসি আমরাও ওই আলো দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জেনেছি, ওই আলো রাজাবাবুই জ্বালান। নীল টেম্পলের ওই মাথায় উনিই রোজ মশাল জ্বালিয়ে রাখেন!

—কেন ?

—কে জানে, কেন! তবে বাংলো থেকে ওই আলোটা কখনো গাছের পাতার আড়ালে পড়ে যায়, তখন মনে হয় নিভে গেল। ডালটা সরে গেলেই মনে হয় জ্বলে উঠল।

রেখাদেবীর কথা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল না। ব্রতীশ এক পলক নিরব থেকে বলল, ঠিক আছে রাণীমাকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, সে জায়গাটা দেখাবেন চলুন।

রেখা আবার পাথরের ওপর থেকে উঠে দাঁড়ায়, আসুন, ওই সামনের দিকেই আর একটা গুহা আছে।

এগোতে শুরু করে রেখা। ব্রতীশ আর অরুণ ওকে অনুসরণ করে। বড় বড় কয়েকটা পাথরের আড়াল দিয়ে একটা বিরাট কালো রঙের পাথরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় ওরা। পাথরটা বড অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আরো একটু এগিয়ে পাথরের গায় প্রাচীন খোদাই করা কিছু কিছু আবছা মূর্তির চিহ্ন চোখে পড়ল ওদের। প্রাচীন শিল্পকর্ম যে সন্দেহ নেই।

রেখা বলল, এই পাথরটাই গুহায় ঢুকবার দরজা। এর গায়ে এই যে চিত্রগুলি দেখছেন সম্ভবত এগুলিও সেই বিম্বিসারের আমলের।

—কি করে বুঝলেন ?

—এর গায়ে এই যে সব লিপি খোদাই আছে, এগুলি পরীক্ষা করলেই হয়তো প্রমাণ পাওয়া যাবে।

—কেউ কি পরীক্ষা করেছেন ?

—জানি না কেউ এ সব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে কিনা, তবে আমরা এর ছবি তুলে রেখেছি। কলকাতায় বিশেষজ্ঞদের দেখাব।

—তাহলে বেশ আঁটঘাট বেঁধেই ঘোরাঘুরি করছেন !

রেখা হাসে, আসুন, ভেতরে ঢুকি আমরা। বলতে বলতে একপাশে সরে গিয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে ও। গায়ের জোরে একটা পাথরের ওপর চাপ দেয়। অবাক হয়ে দেখল ব্রতীশরা। ততক্ষণে ওই বিশাল ভারি পাথরটা একটু একটু করে সরে গুহার মুখটা খুলে যেতে শুরু করেছে।

ব্রতীশ বলল, ওখানে চাপ দিলেই বুঝি এটা সরে যায়।

রেখা আবার পরিচ্ছন্ন হাসল, আপনারা হাজার চেষ্টা করলেও এ চাবিকাঠির সন্ধান পেতেন না। আমরাই এভাবে একদিন রাজাবাবুকে এই পাথরটা সরাতে দেখেছিলাম।

তাকিয়ে থাকে ব্রতীশরা।

—এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো আমাকে। রেখা আবার ডাকল, আসুন।

তবু বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে ব্রতীশরা। কিন্তু বিশ্বাসই করি আর অবিশ্বাসই করি নতুন কিছুতো জানা যাচ্ছে, ফলে ওকে অনুসরণ করাই ভালো।

ততক্ষণে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়েছে রেখা।

ব্রতীশ আর অরুণও ওকে চোখ ছাড়া করতে পারে না। ওরাও ঢুকে পড়ল।

ঢুকে অবাক হয়ে গেল, এটাকে ঠিক সুড়ঙ্গ বলা চলে না। বিরাট একটা হল-ঘরের মতো ছড়ানো জায়গা। গুহার মুখ দিয়ে অল্প অল্প আলো ঢুকছিল ভিতরে। সেই আবছা আলোয় দেখা গেল, দেয়াল, ছাদ সবই কেমন মসৃন পাথর দিয়ে গড়ে তোলা। দেয়ালে অসংখ্য হিজিবিজি আঁচড়, লেখা, ছবি। লেখাগুলো পড়বার উপায় নেই, আলো এত কম।

—দেশলাই আছে ?, প্রশ্ন করে রেখা।

তাড়াহুড়োয় বাংলো থেকে বেরুবার সময় সিগারেট দেশলাই কিছুই নিয়ে আসা হয়নি। অরুণ বলল, না।

—ঠিক আছে, দাঁড়ান ওদিকটায় দেখি। খানিকটা এগিয়ে দেয়ালের পাশ থেকে একটা মোমের টকরো কুড়িয়ে নিল ও। কাল এটাকে ফেলে গিয়েছিলাম।

—কিন্তু দেশলাই কোথায়, মোম যে জ্বালাবেন? প্রশ্ন করে অরুণই।

রেখা বলল, চকমকি ঠুকে জ্বালাতে হবে। মেঝে থেকেই একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে দেয়ালে ঠুকতে শুরু করে ও।

ব্রতীশ অরুণের দিকে তাকায়। কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে মহিলাটিকে। এর আগে রিভলবার দেখিয়েও মেয়েটাকে তেমন

ভয় দেখান সম্ভব হয় নি। বরং মেয়েটাই যেন বরাবর আপার-হ্যাণ্ড নিয়ে নিচ্ছে।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মোমবাতিটা জ্বলে উঠল। মোমের আলোয় ঘরের রহস্যময়তা যেন আরো বেড়ে গেল।

রেখা বলল, এদিকে আসুন। এই যে এপাশে এই সিঁড়িটা নেমে গেছে।

—কি আছে নিচে? প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

—নিচে আর একটা ঘর। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বেদি, সেই বেদিতেই রাণীমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। আসুন আমরা নামি।

বলতে বলতে রেখা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে। উপায় না দেখে ব্রতীশরাও নামতে শুরু করল ওর পেছন পেছন।

বেশ বাঁধানো সিঁড়ি। দেয়াল বেশ মসৃণ আর বরফের মতো ঠাণ্ডা। তাছাড়া সিঁড়িতে নামতে নামতে ওরা বুঝল, বাতাসটা কেমন যেন ভারি হয়ে আছে ভেতরে। কোন কালে এখানে বাইরের বাতাস ঢোকে কিনা সন্দেহ।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এল ওরা। ছোট্ট একটা ঘর। লম্বায় বারো চোদ্দ ফিটের বেশি নয়, প্রস্থেও তাই। আর ঠিক মাঝখানে সত্যি সত্যি একটা পাথরের বেদি। শ্বেত পাথর-টাথর হবে হয়তো। বেদিটা ফাঁকা।

—এই সেই ঘর। রেখা বলতে বলতে একেবারে বেদির কাছে এগিয়ে আসে। মোম হাতে রেখাদেবীকে এখন অশরীরীর মতো মনে হচ্ছে। সত্যি সাহস আছে মেয়েটার।

ব্রতীশ আর অরুণও বেদির কাছাকাছি এগোল।

—এই বেদিতেই রাণীমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি এখানেই নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিলেন, তারপর কি যে হয়েছে কেউ জানে না। তবে আমাদের ধারণা, রাজাবাবু ওকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

—কেন ?

—কেন বলা বড় মুস্কিল। রাজাবাবুকে এখন হাতের কাছে পাওয়াই মুস্কিল। তবে উনি যে একা একা এই টেম্পলের গুহায় দিন রাত ঘুরে বেড়ান তাতে সন্দেহ নেই। একটু অপেক্ষা করুন না, আমাদের সাড়া পেলে এখানেও একবার উঁকি মেরে আমাদের ধমকিয়ে আবার উনি মিলিয়ে যাবেন। কেমন ক্ষ্যাপাটে ধরনের মানুষ যেন।

হাঁ করে শুনছিল ব্রতীশরা। জিজ্ঞেস করল, রাজাবাবু কি এখানে একাই থাকেন ? ওর সঙ্গে আর কেউ থাকে না ? আগে লম্বু নামে কে একজন ওর সঙ্গে থাকত বলে শুনেছি।

—ঠিকই শুনেছেন। আমারাও সুন্দরগাঁওয়ে লম্বুর কথা শুনেছিলাম কিন্তু এখন রাজাবাবু একা একাই এখানে ঘুরে বেড়ান, হয়তো রাণীমার মায়া কাটাতে পারছেন না, তাই।

—একা একা এভাবে কি কারো পক্ষে থাকা সম্ভব।

—অসম্ভব মনে হলেও, রাজাবাবুকে এখানে যদি দেখতে না পেতাম তাহলে এক কথা ছিল।

অরুণ আর ব্রতীশ চুপ করে রইল। রেখাদেবী জ্বলন্ত মোমটা নিয়ে দেয়ালের দিকে সরে এল, এই যে এদিকে আসুন। দেয়াল আঙুল তুলে দেখাল রেখা, লেখাগুলো পড়তে পারেন ?

চখ বুলোন অসংখ্য হিজিবিজি। লেখাগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করে ওরা। ভাঙাচোরা কিছু কিছু শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝার উপায় নেই।

রেখার মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে, প্রথম দিনই পারবেন না। পরপর কয়েক দিন এসে চেষ্টা করলে পারবেন। আমরাও প্রথম দিকে পারি নি।

—কি লেখা ও-গুলি ?

রেখা আবৃত্তি করে করে দু' একটা পড়ল, কতকাল আর ও-ভাবে

চোখ খুলে তাকিয়ে থাকবে? প্লিজ চোখ বন্ধ করো। ঘুমোও, একটু ঘুমোও। তারপর এই দেখুন, কতবার 'ঘুমোও' শব্দটা লিখেছে।

তাকিয়ে থাকে ব্রতীশরা।

রেখা বলল, এ থেকে এটা মনে হয়, রাণীমার চোখদুটো মৃত্যুর পরও হয়তো জ্বলজ্বল করে খোলা ছিল।

গা শিরশির করে ওঠে অরুণের।

রেখা বলল, আসলে এই লেখাগুলো রাজাবাবুরই মনের কথা। আমার মনে হয়, রাজাবাবু রোজ এখানে আসতেন। হয়তো অপলক দৃষ্টিতে রাণীমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আর ওই সব কথা লিখে লিখে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। এই যে এদিকে দেখুন, কতবার ঘুমোও ঘুমোও লিখেছেন।

একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করলে তাই মনে হয়। ব্রতীশ আর অরুণ নিস্পলক তাকিয়ে থাকে।

দেয়ালের এপাশে ওপাশে জ্বলন্ত মোমের টুকরোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকে রেখা। কোথাও কোথাও বা গাছ লতাপাতার ছবির মতো মনে হয়। কোথাও পাহাড়ের চূড়ার মতো। কোথাও আবার এমন দুর্বোধ্য যে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

—এই দেখুন, এখানে আবার কি লেখা আছে।

ব্রতীশ আর অরুণ আবার ঝুঁকে পড়ে। কাঁপা হাতের লেখা হলেও একটু কষ্ট করলেই পড়া যায় এবার, ব্রতীশ শব্দ করে করে পড়বার চেষ্টা করল, ঘুমুচ্ছ না কেন, যদি নাই ঘুমোবে, এসো না গল্প করি। এই দেখ আমি বসে আছি, তোমার পাশটিতেই আমি—এরপর আবার অস্পষ্ট।

রেখা বলল, রাজাবাবু এই ঘরে এসে যে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটাতেন তারই প্রমাণ এ-গুলো। ইন্দ্রর ধারনা, রাজাবাবুর হয়তো মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ফলে দেহটাকে হয়তো উনি নিজের হাতেই নষ্ট করে ফেলেছেন।

—ইন্দ্র কে? অরুণ জিজ্ঞেস করতেই ব্রতীশ বলল, ইন্দর সিং। তাই না?

—হ্যাঁ, ইন্দ্র মনে করে রাজাবাবু হয়তো রাণীমার দেহটা দাহই করে ফেলেছেন। হয়তো নিজের মৃতুর পর যাতে তাঁর দেহটাও দাহ করা হয় সে রকম কিছু উইল টুইলও করে রেখেছেন। কিংবা কাউকে কিছু নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

উইল করেছেন? কি করে জানলেন?

—অনুমানেই বলা নাও করতে পারেন।

—আপনার কি মনে হয়, যাকে উনি অত ভালবাসতেন তাঁকে দাহ করে ফেলতে পারেন?

—আমার ধারণা রাণীমার দেহটা এখনো এখানেই কোথাও রাখা আছে। ইন্দ্রর সঙ্গে এই নিয়ে আমার অনেক কথা কাটাকাটিও হয়েছে। আসলে ইন্দ্র এই নীল টেম্পলে ঘোরাঘুরি এত পছন্দ করে না। প্রায়ই আমাকে বলে, চলো এবার ফিরি। বলুন, এভাবে কখনো ফেরা যায়!

—তার মানে আপনি যতক্ষণ না রাণীমার দেহটা দেখতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ এই জায়গা ছাড়তে চান না।

রেখা মৃদু হাসে, এত দিন এখানে এত কষ্ট করে ঘোরাঘুরি করলাম, না দেখে ফেরাটা কি উচিত! তা ছাড়া রাজাবাবুর দেখা না পেলে এক কথা ছিল।

—রাজাবাবুর সঙ্গে কখনো কথা হয় নি আপনাদের?

—কথা, ওরে বাবা, লোকটা সব সময় কেমন যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে বাইরেই থাকতে চান। কখনো হয়তো আমরা মুখোমুখি পড়ে গেলাম, আর অমনি আমাদের গালি-গালাজ করতে করতে পালিয়ে যান। একেবারে বদ্ধ পাগলের মতো। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, আসলে কি জানেন, ইন্দ্রটা ভীষণ ভিতু। এ-সবের মধ্যে ঢুকতেই চায় না। সে যাক, আসুন দেয়ালগুলো দেখি।

—রেখাদেবীর সেই মোমের টুকরোটা তো এ ঘরেই পড়েছে। ওঠ খুঁজে দেখ।

—কোথায় খুঁজব ?

—মেঝেতেই কোথাও পড়েছে। হাত বুলিয়ে দেখ না। পেয়েও যেতে পারি।

—মোমের টুকরো পেলেই বা কি ! দেশলাই নেই।

ব্রতীশ ততক্ষণে মেঝেতে উবু হয়ে বসে হাত বুলোতে শুরু করেছে। মোমটা হাতে পেলে মেয়েটার মতো চকমকি ঠোকা যায় কিনা দেখতে হবে।

হাত বোলাতে বোলাতে ঘুরতে থাকে ব্রতীশ। স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা মেঝে, অমসৃন। বহুকালের ধুলো জমে আছে বলে মনে হল ওর।

—দেখ না। মোমটা পেলে কিন্তু খুব উপকার হয়।

অরুণ কোন কথা বলে না। এই অন্ধকারে সামান্য ওইটকু মোমের টুকরো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া টুকরোটাকে রেখা তুলে নিয়ে গেছে কিনা তাইবা কে জানে ! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এ ছাড়া এখন তো আর উপায়ও নেই। একবার খুঁজে দেখতেই বা দোষ কি !

কিছুটা ইতস্ততভাবে হাত বোলাতে শুরু করে অরুণও। ঘরের মেঝেটা যে এত ঠাণ্ডা এতক্ষণ টেরই পায়নি ও। হাত ছুঁইয়ে মনে হল, বেশ ঠাণ্ডা। প্রায় বরফের মতো ঠাণ্ডা।

—কি রে, কি করছিস ? জিজ্ঞেস করে ব্রতীশ।

অরুণ ও-পাশ থেকে উত্তর দেয়, অসম্ভব। পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মেঝেটা কী ঠাণ্ডা রে !

—পেতেই হবে। না পেলে আমাদের চলবে না। ভাল করে দেখ।

—দেখছি তো, কিন্তু একটু থেমে অরুণ বলে উঠল, মেয়েটা যে এভাবে আমাদের বোকা বানাবে বুঝতেই পারি নি। যেভাবে কথা বলছিল, তাতে ওকে সন্দেহ করাও মুস্কিল।

আসলে ভুলটা আমারই হয়েছে। সারাক্ষণ রিভলবারের মুখে রাখা উচিত ছিল ওকে। ব্রতীশের গলায় আক্ষেপ।

অরুণ চুপ করে শুনল। মেঝেয় হাত বুলোনর শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। বেশ কিছুক্ষণ ওই ভাবে কেটে যাওয়ার পর অরুণই আবার কথা বলল, মেয়েটার উদ্দেশ্য কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না। কি চায় ও?

—যাই চাক, একটা জিনিস পরিষ্কার, ও আমাদের রাইভ্যাল ভেবেছে। নইলে এ ঘরে ঢুকিয়ে আমাদের আটকে দিত না সব কিছু ও প্ল্যান করে করেছে।

—এখন এ ঘর থেকে যদি বেরুতে না পারি?

ব্রতীশ খানিকটা ঠাট্টার সুরে বলল, কি আর হবে। এ ঘরে যা বাতাস, তাতে দেড় দু'দিন চলতে পারে। তারপর ওই রাণীমার বেদিতে শুয়ে থাকতে হবে আমাদের।

ঠাট্টাটা ভাল লাগল না অরুণের। চুপ করে থাকা ছাড়াও উপায় নেই। কী কুক্ষণেই যে এই ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কলকাতা ছেড়েছিল ও। রঘুর কথা মনে পড়ল। রঘু এখন কলকাতায় ফ্ল্যাটে একা একা কি করছে কে জানে!

—কি রে ভয় পেয়েছিস? প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

অরুণ এবারও জবাব না দেওয়ায় ব্রতীশ হেসে উঠল, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হয়েছিস, অথচ এই সামান্য ঘটনাতেই এত ভেঙে পড়লি? তোর দ্বারা এ কাজ হবে না দেখছি।

—ভেঙে পড়ার কথা নয়, আসলে পৃথিবীর কেউ জানতে পারল না, আমরা এখানে বন্দী হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি। এটা ভাবতেই কেমন খারাপ লাগে।

ব্রতীশ গম্ভীর হয়ে ওঠে, দেখ অরুণ, কালপ্রিট যে, সে যাই করুক একটা কিছু চাবিকাঠি রেখে যাবেই।

—মানে!

—মানে আর কিছুই নয়, একটু অপেক্ষা কর না, এই গুহাঘর থেকে বেরুবার রাস্তা আমরা পাবই। আগে দরকার মোমের টুকরোটা। এক চিলতে আলো যে ভাবেই হোক দরকার। তাই বলছিলাম সারাঘর আমাদের তন্ন তন্ন করে খোঁজা উচিত, মোমের টুকরোটা যদি পাওয়া যায়।

ব্রতীশের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। অরুণ চুপ করে মেঝেতে খুব সাবধানে আবার হাত বোলাতে থাকে। আবার খসখস শব্দ হতে থাকে।

আবার কিছুক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ চমকে ওঠে অরুণ, ওপাশে ব্রতীশটা বোধহয় কোন কিছুতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়েছে।

—কি রে? কি হল? গলায় কেমন আতঙ্ক অরুণের?

ব্রতীশ ততক্ষণে সামলে উঠেছিল, বলল, একটা পাথর উঠে আছে এখানটায়, বুঝতে পারিনি।

—লেগেছে?

—সামান্য। ও কিছু না। তবে ঘরের মধ্যে একটা শিবলিঙের মতো পাথর কেন? তাই ভাবছি।

—কোথায়?

—এই তো এখানে। এদিকে আয়। আমার গলার স্বর লক্ষ্য করে করে এগিয়ে আয়।

অরুণ ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

—এই যে, এদিকে আয়, এদিকে।

একেবারে কাছাকাছি এগিয়ে এল অরুণ। হ্যাঁ, শিলনোড়ার শিলের মতো একটা পাথর। বেশ মসৃন বলেই মনে হল। তাইতো, একটু একটু নড়ছে, যেন মাটিতে খানিকটা গর্ত করে ওটাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

—কি হতে পারে বলতো? প্রশ্ন করে অরুণ।

—শিব-টিবও হতে পারে। যাক গে, মোমটা পাওয়া যায় কিনা

দেখ। তুই ও-পাশটা দেখেছিস? বেদির এই ডান পাশেই মোমটা ওর হাত থেকে পড়েছিল বলে মনে হচ্ছে।

অরুণ বলল, আমি নিশ্চিন্ত, ও নিয়ে পালিয়েছে। নইলে এতক্ষণ ঠিক পেয়ে যেতাম।

ব্রতীশ উত্তর দেয় না। আবার খুঁজতে শুরু করে। উবু হয়ে মেঝে খামচাতে খামচাতে এগোতে থাকে।

হঠাৎ অরুণেরই হাতে লেগে যায় মোমটা। হ্যাঁ মোমই। পেয়েছি রে। চেঁচিয়ে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে অরুণ।

—পেয়েছিস! শব্দ লক্ষ্য করে ব্রতীশ এগোয়। দেখি, দেখি।

ব্রতীশের হাতে মোমটা তুলে দেয় অরুণ, কিন্তু জ্বালবি কি করে?

ব্রতীশ মোমটা হাতের মুঠোয় চেপে রাখে। দেয়ালে পাথর ঠুকে ঠুকে জ্বালাবার চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা যে ভাবে জ্বলিয়েছিল ঠিক সেই ভাবে। আয় না চেষ্টা করি।

—কিন্তু পাথর কোথায়! সারা ঘরে কেবল ধুলো আর ধুলো। কিছুক্ষণ নিরব থাকে ওরা। হঠাৎ অরুণের মাথাতেই বুদ্ধিটা খেলে গেল, অরুণ বলে, শিব না কি বলছিলি, ওটাকে তোলা যায় না?

ব্রতীশ লাফিয়ে উঠল, দি আইডিয়া। আবার হাতড়ে হাতড়ে পাথরটার কাছে এগিয়ে এল ওরা। একটু এপাশ ওপাশ নেড়ে দেখল, হ্যাঁ, নড়ছে। আলগাই মনে হচ্ছে। কিন্তু চট করে গর্ত থেকে তুলে আনা সম্ভব নয়।

দু'জনে মিলে ঝাঁকাতে শুরু করে পাথরটাকে, কিন্তু পাথরের নিচের অংশ কিছু একটার সঙ্গে যেন গর্তের ভেতরে আটকানো। কৌশল জানা না থাকলে তুলে আনা সহজ নয়।

অরুণ বলল, অসম্ভব, খুলবে না।

ব্রতীশ নাছোড়বান্দা। পাথরটাকে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাবার চেষ্টা করে। হঠাৎ মনে হল, স্ক্রুর প্যাঁচের মতো যেন ডান থেকে বাঁয়ের দিকে ঘুরে যাচ্ছে। আরো ঘোরাতে থাকে ব্রতীশ।

পাথরটা সত্যি সত্যি যেন আলগা হয়ে খুলে আসছে। হ্যাঁ খুলেই এল শেষপর্যন্ত।

আর সেই মুহূর্তে আর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটতে লাগল। অদ্ভুত একটা একটানা শব্দ শুনতে পেল ওরা। বহুকালের মরচে পড়া পুরনো একটা দরজা খুলতে গেলে যেমন শব্দ হয়, অনেকটা সে রকম।

স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করল ওরা। আরো দু'এক মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ মনে হল, সামনের দেয়ালের দিকে দরজার মতো একটা পাল্লা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। ব্রতীশ ঝট করে পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে তৈরি হল। দরজার ওই ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ এক চিলতে আলোও এসে যেন এ ঘরে ঢুকে পড়েছে।

—কি ব্যাপার বলতো ? ফিসফিস করে প্রশ্ন করে অরুণ।

ব্রতীশ হাঁ করে খোলা দরজার ফাঁকটুকুর দিকে তাকিয়ে ছিল তখনো। দরজার ও-পাশে কি আছে কে জানে! যাই থাক, পাথরটা খুলে ফেলার জন্যই যে দরজাটা খুলেছে সন্দেহ নেই।

আরো কিছুক্ষণ পর শব্দটা থেমে গেল। দরজার পাল্লাটা এখন পুরোপুরি খোলা। ব্রতীশ আর অরুণ মুখ চাওয়া-চাইয়ি করল। অরুণ আবার ফিসফিস করে বলল, মনে হচ্ছে, ওপাশেও একটা ঘর। ও ঘরের আলো বাতাস এ ঘরে ঢুকছে।

ব্রতীশ জবাব না দিয়ে দু'পা দরজার দিকে এগোল।

অরুণও খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়াল।

যা ভেবেছিল ওরা তাই। ও-পাশেও একটা ঘর। কিন্তু কি আছে ও ঘরে। কেউ কি ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। আবার মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে ওরা। অবশেষে ব্রতীশ রিভলবারের ট্রিগারে আঙুল রেখে একেবারে দরজার গায় গায় এগিয়ে আসে।

আশ্চর্য! ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা কম্বলের ওপর শুয়ে আছে একটা মানুষ। পরনে আলখাল্লা। সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী গোছের চেহারা। সারা মুখে দাড়ি-গোঁফ। ঘুমুচ্ছে লোকটা।

ঘরটা আয়তনে বড় নয়। চারপাশেই দেয়াল। দশ বারো ফিট ওপরে গোটা দুয়েক ভেন্টিলেটার। বাইরের আলো ওখান দিয়েই ঢুকছে বোঝা যায়।

কিন্তু লোকটা এখান থেকে যে বাইরে বেরুবে তার রাস্তা কোথায়! তবে কি লোকটাও বন্দী হয়ে আছে এখানে!

—কে রে বাবা! চাপা গলায় ব্রতীশ প্রশ্ন করে অরুণকে।

—আমার মনে হচ্ছে, এই আসল রাজাবাবু। বার্মিজ ভিলায় রাজাবাবুর যে ছবি দেখেছিলাম তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। এই রকমই লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল তাঁরও।

ব্রতীশ অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটাকে পরীক্ষা করল, তারপর বলল, আয় ভেতরে ঢুকি।

ভেতরে ঢুকে নিঃশব্দে ঘুমন্ত লোকটার কাছাকাছি এগিয়ে এল ওরা। না, ঘুমুচ্ছে যে সন্দেহ নেই।

ব্রতীশ ঝুঁকে লোকটাকে ডাকল, ও মশাই? শুনছেন? রিভলবার সমেত একটা হাত ব্রতীশ পিছন দিকে সরিয়ে রাখে।

আরো একবার ডাকতেই হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসল লোকটা, কে? কে?

—আমরা। উত্তর দিল ব্রতীশ।

—আমরা কে? লোকটার চোখদুটো কেমন ঘোলাটে। সারা মুখে কেমন ক্লান্তি আর বিরক্তি। আবার চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, আমি তো বলেছি, জীবন থাকতে আমার কাছ থেকে তোমরা কিছুই পাবে না।

অরুণ আর ব্রতীশ কেমন অবাক হয়।

—আজ্ঞে, আমরা কিছুই চাইতে আসি নি। আপনি ভুল করছেন।

লোকটা চোখ তুলে তাকাল। তারপর বসা অবস্থাতেই নিজেকে একটু একটু করে সরাতে সরাতে প্রায় দেওয়ালের কাছে টেনে নিল। ঘোলাটে চোখে কেমন সন্দেহ।

অরুণ বোঝাবার চেষ্টা করে, আজ্ঞে বিশ্বাস করুন, আমরা কিছুই জানি না এখানকার।

লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, কে তোমরা ?

ব্রতীশ উৎসাহ পেয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা কলকাতা থেকে নীল বাংলোয় বেড়াতে এসেছিলাম। বুঝতে পারি নি, এত সব ঝামেলায় পড়ে যাবো।

লোকটা হঠাৎ বীভৎসভাবে হেসে উঠল, বন্ধ ঘরের ভেতর গমগম করে উঠল হাসিটা। অরুণ আর ব্রতীশ কেমন গুটিয়ে গেল।

হাসি থামতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, ডাইনীটাকে বলে দিও, জীবন থাকতে আমি মুখ খুলব না।

—ডাইনী ! কেমন অবাক হয় ওরা।

—কেন, চেন না ? যে তোমাদের পাঠিয়েছে এখানে ?

—আজ্ঞে বিশ্বাস করুন, কেউ আমাদের পাঠায় নি। আমরা জানতামই না আপনি এখানে রয়েছেন। আপনি যে কে, তাও আমরা জানি না।

—জান না, তাহলে গন্ধে গন্ধে এখানে এলে কিভাবে ? ভেবেছ আমি তোমাদের চালাকি বুঝি না, না ?

—বিশ্বাস করুন, আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার জন্যই নীল বাংলোয় এসেছিলাম। বাংলোয় এসে ইন্দর সিং নামে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল, তার স্ত্রী রেখাদেবীর সঙ্গেও আলাপ হল। ওদের মুখেই এই টেম্পলের রহস্য গল্প শুনেছিলাম।

—রহস্য ! কী রহস্য !

—না মানে, সন্ধ্যার সময় এই বাংলোর দিক থেকে একটা আলো জ্বলে ওঠে, আবার নিভেও যায় মাঝে মাঝে। ওরা বলছিল, এসব নাকি অপদেবতাদের কীর্তি। তাই কেমন সন্দেহ জেগেছিল।

—বটে, তারপর ?

ব্রতীশ বিশ্বাসযোগ্য করে বলার চেষ্টা করল কিভাবে এই গুহা আবিষ্কার করল ওরা। কিভাবে রেখাদেবীর সঙ্গে পরিচয় হল। কিভাবে রেখাদেবী ওদের পাশের ঘরে আটকে রেখে পালিয়ে গেল ইত্যাদি।

লোকটা জ্বলজ্বল চোখে কথা শুনছিল। চোয়াল কেমন ঝুলে পড়েছিল ওর।

ব্রতীশ একটু থেমে আবার বলল, রেখাদেবীর চালাকি আমরা বুঝতে পারি নি। ওরাই বলেছিল, রাণীমার দেহটা নাকি এখানে রেখে দেওয়া আছে। শুনে কেমন কৌতূহল জেগেছিল, তাই এই গুহার মধ্যে ঢুকে আটকা পড়ে গেছি। দয়া করে গুহা থেকে আমাদের বেরুবার পথটা বলে দিন, আর কক্ষনো আসব না। আর কোন দিন এদিকে এগোব না।

বুড়োটা দাঁতে দাঁত চাপল, ডাইনী!

—আজ্ঞে!

—ডাইনীটা আমাকে এক বছর ধরে এখানে আটকে রেখেছে। রোজ দিনের শেষে একবার করে খাবার রেখে যায়, জল রেখে যায়। কত দয়া। এর চেয়ে আমাকে মেরে ফেললেও ভাল হত।

ব্রতীশরা চুপ করে থাকে।

—তবে তোমাদেরও বলে রাখি বাপু, তোমরা হাজার চেষ্টা করো আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না। আমাকে মেরে ফেললেও না।

ব্রতীশ একটু ঝুঁকে এগিয়ে এল লোকটার কাছে। আমাদের দেখে কি সে রকম মনে হচ্ছে আপনার? বিশ্বাস করুন, আমরা কিছুই চাই না। আমাদের শুধু বেরুবার পথ বলে দিন, ব্যাস, আমরা চলে যাই।

লোকটা আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের দু'জনকে দেখল, কিছুই চাও না! ঠিক আছে, কলকাতায় কোথায় থাকা হয়?

—আজ্ঞে বালিগঞ্জে।

—কি করা হয়?

ব্রতীশই উত্তর দিচ্ছিল, বলল, সামান্য চাকরি। দু'জনেই চাকরি করি। ছুটি পাওনা ছিল, তাই দিন কয়েকের জন্য বেরিয়ে পড়েছিলাম।

—রাণীমাকে যে এখানে রাখা আছে, জানলে কি করে?

—আজ্ঞে ওই যে বললাম, ওরা বলেছে, ওই ইন্দর সিং আর রেখাদেবী। নইলে কি করে জানব বলুন।

ওরা বলল রাণীমার দেহটা এখানে রাখা আছে? কোথায় রাখা আছে?

—আজ্ঞে, ওরাও ঠিক তা জানে বলে মনে হল না। ওরা বলে, রাজাবাবু নাকি এই নীল টেম্পলে ঘুরে বেড়ান। রাণীমাকে উনি এখানেই কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন।

আবার হো হো করে বিচিত্রভাবে হেসে উঠল লোকটা, রাজাবাবু লুকিয়ে রেখেছেন।

—আজ্ঞে! ওরা তো তাই বলেছিল। রাজাবাবুর মতো একটা লোককে আমরা এই গুহার ভেতরে ঢুকতেও দেখেছিলাম তখন।

হঠাৎ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল লোকটা, মিথ্যে কথা, স্রেফ মিথ্যে কথা।

ব্রতীশরা আবার হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

—আমিই সেই রাজাবাবু, আমিই সেই বিখ্যাত দেববর্মন পরিবারের বংশধর।

আপনি!

—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? উলকি পড়তে পার?

—আজ্ঞে!

লোকটা ততক্ষণে তার ডান হাত এগিয়ে ধরেছে। দেখ, কি আঁকা আছে এই হাতে।

একটু ঝুঁকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করে ব্রতীশ। হিজিবিজি কি

একটা ছবি যেন। কিন্তু অরুণ সেই ছবিটা চিনতে পারল, এতো সেই জগৎতাড়িনীদেবী!

হাতটা আবার গুটিয়ে নিল লোকটা। ওরা মিথ্যে কথা রটিয়েছে।

—আপনিই রাজাবাবু! তবে গুহায় গুহায় যে লোকটা ঘুরে বেড়ায় সে কে?

—কে ঘুরে বেড়ায়?

ব্রতীশ বুঝল, রাজাবাবু সেজে একজন যে নিজেকে জাহির করতে চাইছে, সে আসলে দু'নম্বরী। কিন্তু কে সে! তবে কি ইন্দর সিংটাই রাজাবাবুর পোষাকে ওদের ফলস দিতে চেয়েছিল। ইস্, আর একটু রয়ে সয়ে এগোলে ভাল হত। বড্ড হুড়োহুড়ি করে ফেলেছে ওরা। ইন্দর সিং আর রেখা এতক্ষণে না জানি পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে গেছে বাংলো ছেড়ে।

—কে ঘুরে বেড়ায়? আবার প্রশ্ন করে রাজাবাবু।

ব্রতীশ বলল, আজ্ঞে, দূর থেকে একবার মাত্র লোকটাকে আমরা এদিকে আসতে দেখেছিলাম, ঠিক আপনারই মতো ঢিলেঢালা আল-খাল্লা পরা। মুখে দাড়িগোঁফ। রেখাদেবী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, উনিই নাকি রাজাবাবু।

আবার হো হো করে হেসে ওঠে লোকটা। তারপর হাসি থামিয়ে বিড়বিড় করে ওঠে, ডাইনী!

ব্রতীশ আর অরুণ থমকে থাকে।

লোকটা অর্থাৎ রাজাবাবু একটু সময় নিয়ে আবার বিড়বিড় করে ওঠে, তা যতই ওরা কষ্ট দিক আমাকে, আমি কক্ষনো রাজি হব না। কক্ষনো না।

ব্রতীশ খুব নরম গলায় প্রশ্ন করল, কি রাজি হবেন না?

রাজাবাবু হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, চোপ! কোন কথা নয় তোমাদের সঙ্গে। তোমরা যে ওদের লোক নও, প্রমাণ দেখাতে পার?

মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে ব্রতীশরা। তারপর ব্রতীশই বোঝাবার চেষ্টা করে, আমরা যদি ওদেরই লোক হব, তাহলে আমাদের ও-ঘরে আটকে রেখে পালিয়ে যাবে কেন মেয়েটা ?

—ভাল অভিনয় জানো দেখছি হে ছোকরা। যাও, যে পথ দিয়ে এখানে এসেছ, সে পথ দিয়েই আবার ফিরে যাও। গিয়ে ওদের বলে দাও, রাজাবাবুর কাছ থেকে তোমরা কিচ্ছু পাবে না। কিছু না।

ব্রতীশ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ অরুণ ওকে থামিয়ে দিল, ঠিক আছে, সত্যি কথাটাই শুনুন তাহলে, আমরা বার্মিজ ভিলা থেকে আসছি। ছোট রাণীমা আমাদের পাঠিয়েছেন।

বৃদ্ধের চোখমুখ কেমন ফ্যাকাসে উঠল, কি বললে ?

—আজ্ঞে, আপনার হাতে জগৎতাড়িনীদেবীর উলকি কাটা আছে, তাতেই প্রমাণ হচ্ছে আপনি আসল রাজাবাবু। আমি বার্মিজ ভিলার দেবী মন্দিরে জগৎতাড়িনী মূর্তি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। ছোট রাণীমা আমাদের দেখিয়েছেন। এবার বিশ্বাস করছেন ?

—কে তোমরা ? আবার চেঁচিয়ে উঠলেন রাজাবাবু।

—বিশ্বাস করুণ, বার্মিজ ভিলার অন্ধকার ঘরে স্বামী শুদ্ধানন্দকে যেখানে শোয়ানো আছে, সে ঘরও আমি দেখেছি। আপনি শুনতে চাইলে, পুরো বর্ণনা দিয়ে যেতে পারি।

—সুভদ্রা তোমাদের পাঠিয়েছে ? লোকটার চোখেমুখে বিস্ময়।

—বিশ্বাস করুন, সুভদ্রাদেবীই আমাদের পাঠিয়েছেন। উনি খুব অসুস্থ। চব্বিশ ঘণ্টা কেবল আপনার কথাই বলেন।

শূন্য চোখে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলেন রাজাবাবু। কি বলে ?

—আপনার কাছেই উনি আবার ফিরে আসতে চান। আপনার প্রস্তাবেই উনি রাজি।

—অসম্ভব। হতে পারে না।

—আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে, কলকাতায় ওর কাছে চলুন, আমরা ঠিক বলছি কিনা জানতে পারবেন।

রাজাবাবু কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

অরুণ বলল, রাণীমা ঠিক করেছেন, আপনি যদি ওকে আশ্রয় নাও দেন, উনি মৃত্যুর পর ওর দেহটাকে বার্মিজ ভিলাতেই রক্ষা করবেন।

এবার হো হো করে উঠলেন রাজাবাবু, কিভাবে?

—বিজ্ঞানের যুগে এটা কি একটা অসম্ভব কাজ?

রাজাবাবু চুপ করে গেলেন। গভীরভাবে কি যেন ভাবলেন।

অরুণ উৎসাহ পেয়ে বলল, লিকুইড নাইট্রোজেনের সাহায্যে যে কোন বডিকেই বছরের পর বছর অটুট রেখে দেওয়া যায়।

—বটে! তোমারা বুঝি সেই বিজ্ঞানী?

—আজ্ঞে, রাণীমা আমাদের সাহায্য চেয়েছেন। তাই আমরা সব ব্যাপারটা আপনাকে জানাবার জন্য এখানে ছুটে এসেছি। আমরা ভেবেছিলাম, সহজেই আপনার দেখা পেয়ে যাব, কিন্তু মাঝখানে যে এত ব্যাপার ঘটে গেছে, আঁচ করতে পারি নি।

রাজাবাবুর দুর্বল শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল, বোঝা গেল, ওষুধে কাজ হয়েছে।

—সুভদ্রা অসুস্থ না কি যেন বললে তখন? রাজাবাবু হঠাৎ আবার জ্বলজ্বলে চোখে তাকালেন।

অরুণই উত্তর দিল, আজ্ঞে খুবই অসুস্থ। শরীরের নিচের অংশটা পঙ্গু হয়ে গেছে। এখন আর নিজের পায়ের জোরে চলাফেরাও করতে পারেন না। আর কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে, বেশি দিন উনি বাঁচবেন না।

বৃদ্ধের চোখদুটো ঝাপসা হয়ে উঠছিল। ব্রতীশ বলল, আপনি কলকাতায় গেলে হয়তো আবার উনি ভাল হয়ে উঠবেন। ওকে এখন থেকে আপনার কাছেই রাখা উচিত।

—না, তা আর হয় না।

—কেন?

—তার মানে মৃত্যুর পর দেহকে যে অটুট রাখা যায় দিনের পর দিন, সে বিদ্যা ওই পুঁথিতে লেখা আছে?

—আছে বলেই তো এত লোভ ওদের। শয়তানগুলো ওই পুঁথির খোঁজ কি ভাবে যে পেয়েছে জানি না তবে যে ভাবেই পাক, ভেবেছিল আমাকে ভয় দেখিয়ে তা আদায় করে নেবে। জেনে রেখো, দনুজদলন কারো ভয়ের তোয়াক্কা করে না।

—ওরা তাহলে ওই পুঁথির লোভেই আপনাকে এ ভাকে আটকে রেখেছে। এক বছর ধরে আপনাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে ওরা, কোন ভাবে বাইরে কাউকে খবরটা জানতে পারলেন না?

রাজাবাবু আবার ব্রতীশের মুখের দিকে তাকালেন, আসলে আমি ভাবতেই পারি নি, ডাইনীটা আমাকে এভাবে ঘরে ঢুকিয়ে আটকে রাখবে। ভীষণ ছলাকলা জানে ডাইনীটা।

অরুণ বলল, আমরাও কিন্তু মেয়েটার কথা বিশ্বাস করেছিলাম বুঝতেই পারি নি, ও আমাদেরও কৌশলে ওভাবে আটকে রেখে পালিয়ে যাবে।

—ওরা সব পারে। রাজাবাবু আবার বেদির দিকে চোখ পেতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

ব্রতীশ বলল, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ওরা ওই পুঁথির জন্য এমন পাগল হয়ে উঠবে কেন! পুঁথিটা যদি ওরা হাতে পায়ও, কি করবে ওরা?

রাজাবাবু উবু হয়ে বসে বেদির ওপর হাত বোলাতে লাগলেন, মানুষকে মৃত্যুর পর দিনের পর দিন যদি তাজা রেখে দেওয়া যায় তাহলে খুনী আসামীদের কত সুবিধে হয় বোঝ না! উদ্দেশ্য যদি খারাপ থাকে, কি না করা যায় ওই পুঁথি দিয়ে।

ব্রতীশ থমকে গেল, ব্যাপারটা সত্যি ভাবার মতো। মানুষ খুন করে অনেক দিন ধরে যদি রেখে দেওয়া যায় ক্রিমিন্যালদের তাহলে পোয়া বারো। বড়ি পচবে না, ফলে জানাজানি হয়ে যাওয়ারও ভয় থাকবে না।

কিন্তু পুঁথি হাতে পায় নি বলে রাণীমাকে তুলে নিয়ে গেছে কেবল ভয় দেখাবার জন্য, এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন? হঠাৎই প্রশ্ন করে অরুণ।

রাজাবাবু আবার বেদির ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, পুঁথি পায় নি বলেই আরো মরীয়া হয়ে উঠেছে ওরা।

—কি রকম?

—হয়তো চিন্ময়ীর দেহটা নিয়ে পরীক্ষা করে বার করতে ছাইছে কিভাবে ওকে আমি রেখেছি। কিভাবে ওর সারা গায়ে আমি মালিশ করেছি। তারপর—

—মালিশ করেছেন?

রাজাবাবু হঠাৎ থমকে গেলেন, না, ও-সব কথা থাক। সুভদ্রা তোমাদের পাঠিয়েছে, তাই বলে মনে করো না, ও-সব তোমাদের আমি শেখাব। ওই পুঁথি তোমাদের হাতে আমি তুলে দেব

ব্রতীশ বলল, আমরা পুঁথির লোভে কিন্তু আসি নি রাজাবাবু—আমরা জানতামই না, স্বামী শুদ্ধানন্দের গোপন কোন পুঁথি আপনার কাছে আছে।

অরুণ কথা কেড়ে নিয়ে বলল, রাণীমাই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা শুধু বলতে এসেছি, রাণীমা এখন তাঁর মত পালটেছেন। উনি এখন আপনার আশ্রয় চান। আপনি যদি রাজি নাও থাকেন, উনি আমাদের সঙ্গে লেখাপড়ি করে নেবেন, আমরাই ওর দেহটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। আপনি কেবল যদি বলে দেন, কিভাবে ওঁকে রাখব তাহলেই হবে, আর কিছুই চাইনা আমরা।

—কেন? তোমাদের বিজ্ঞান কি বলে?

অরুণ অসহায়ভাবে তাকাল, আপনি যে প্রাকৃতিক বিদ্যা জানেন, তার কাছে বিজ্ঞান কিছুই না।

—স্বীকার করছ তাহলে?

অরুণ আগ্রহে বলল, যা সত্যি তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তা ছাড়া, আপনাদের বংশের একটা ঐতিহ্য আছে। বার্মিজ ভিলার সঙ্গে যোগাযোগ না হলে এ-সব আমাদের বোঝার উপায় ছিল না।

অরুণ যেন রাজাবাবুর মন গলাবার জন্যই কথা বলছিল, ব্রতীশ চুপ করে রইল।

রাজাবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

অরুণরাও কিছুক্ষণ নিরব হয়ে অপেক্ষা করল। এই নিস্তব্ধতা ভারি অদ্ভুত। ঘরের ভিতর ছমছমে আঁধারে যেন অশরীরী বড় রাণীমার আত্মা এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসম্ভব নয়, গুহার এই গোপন ঘরের ভিতর যে কোন অলৌকিক ব্যাপার যেন ঘটে যেতে পারে।

অরুণই নিস্তব্ধতা ভাঙল, ডাকল, রাজাবাবু!

রাজাবাবু চমকে উঠে ফিরে তাকালেন।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

তাকিয়েই রইলেন রাজাবাবু।

অরুণ আপনজনের মতো ভঙ্গি করে শুধাল, রাণীমাকে আপনি মৃত্যুর পর অমনভাবে রেখে দিয়েছিলেন কেন?

রাজাবাবুর চোখের মনিদুটো জলে ভরে গেছে কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু লোকটা যে সত্যি সত্যি ভেঙে পড়েছেন সন্দেহ নেই।

অরুণ আবার ডাকল, রাজাবাবু!

রাজাবাবু পালটা প্রশ্ন করলেন, বিয়ে করেছ?

—আজ্ঞে!

কাউকে কখনো প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছ? তা যদি না করে থাক, তাহলে বুঝবে না।

আবার নিরবতা।

কিছুক্ষণ পর রাজাবাবুই আবার বললেন, যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকে যে অত সহজে হারানো যায় না তোমাদের তা বোঝারই বয়স হয় নি। তোমরা বুঝবে না। তা ছাড়া আত্মা রহস্য তোমাদের কি বোঝাব!

ব্রতীশ প্রশ্ন করল, আত্মার ব্যাপারে প্রমাণ দেখাতে পারেন?

রাজাবাবু একটু থমকে গেলেন, এই বেদির ওপরই চিন্ময়ীকে আমি শুইয়ে রেখেছিলাম। প্রতিদিন এই বেদির সামনে এসে চুপটি করে বসে থাকতাম। তারপর কতদিন ওকে দেখেছি জীবন্ত হয়ে উঠতে। ওর সারা দেহে উষ্ণ রক্তস্রোত ছুটাছুটি করতে। তোমরা সে সব বিশ্বাসই করবে না।

—জীবন্ত হয়ে উঠত?

—হ্যাঁ, জীবন ফিরে পেত চিন্ময়ী। আমি কথা বলতাম ওর সঙ্গে, ও শুনত। শুনত, কিন্তু ওর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না!

আবার একটু থমকে রইলেন রাজাবাবু, তারপর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করলেন, আসলে কি জান? জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে বিরাট একটা পাঁচিল তুলে দেওয়া আছে! আমরা এপারে অসংখ্য মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছি, আর ওরাও ওপারে অসংখ্য মানুষ। অসংখ্য আত্মা। আমি সেই দেয়ালের কাছাকাছি এগিয়ে চিন্ময়ীকে ডাকতাম, চিন্ময়ীও এগিয়ে আসত, দেয়ালে কান পেতে শুনত আমরা কথা! হয়তো বলতে চাইত কিছু, কিন্তু—

রাজাবাবুর গলা আবার বুজে এল।

ব্রতীশ আর অরুণ মুখ চাওয়াচাইয়ি করল, রাজাবাবু পুরোপুরি সুস্থ আছেন কিনা কে জানে! কিন্তু রাজাবাবুর আবেগে আঘাত করতে সাহস হল না ওদের।

লোকটা ঝুঁকে আবার সস্নেহে হাত বোলাতে শুরু করলেন বেদির ওপর। তারপর হঠাৎই বেদি ছেড়ে টান টান হয়ে দাঁড়ালেন। আঁতিপাঁতি করে একবার তাকালেন, কোথায়, ওরা কোথায়?

—কে? রেখাদেবী? ইন্দর সিং?

—বাজে কথা, ও গুলো ওদের ছদ্মনাম।

—ছদ্মনাম! আপনি চেনেন ওদের? কি করে বুঝলেন ছদ্মনাম?

—চিনব না। ডাইনীটা ফেউয়ের মতো লেগে ছিল আমার পিছনে, চিনব না!

—কে ও? একটু ভেঙে বলবেন? আকুতি মিশিয়ে প্রশ্ন করে অরুণ।

রাজাবাবু আবার ঝুঁকে পড়লেন বেদির উপরে, প্রশ্নটা এড়িয়ে বললেন, এই যে শ্বেত পাথরটা দেখছ, সরাতে পারবে এটাকে? বেদির এই পাথরটা যদি সরিয়ে ফেলতে পারো, তাহলে এখনি এখান থেকে বেরুতে পারবে। কি হে পারবে?

—এতো নিরেট পাথর। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অরুণ।

রাজাবাবু হাসলেন, এ পথের সন্ধান কেউ জানে না, ওই ডাইনীটাও না। দেখ না হে একটু জোর খাটিয়ে, পাথরটাকে যদি তুলে সরিয়ে ফেলতে পারো। সরালেই দেখতে, পাবে, একটা সুড়ঙ্গ নেমে গেছে পাতালের দিকে। সেই সুড়ঙ্গ ধরে এগোলে নীল ঝোরার কাছে পৌঁছে যাবে।

অরুণরা ঝুঁকে পাথরটাকে পরীক্ষা করল। হ্যাঁ, মনে হল আলগাভাবেই পাথরটা যেন বসানো রয়েছে। কিন্তু এত বড় পাথর নড়ানো কি সম্ভব!

—হাত লাগাও না হে, দাঁড়িয়ে আছ কেন। ডাইনীটা আবার এ ঘরে এসে ঢোকার আগেই আমাদের পালাতে হবে।

ব্রতীশ অরুণের দিকে তাকায়, তারপর দু'জনে একপাশে সরে এসে গায়ের জোরে ধাক্কাতে শুরু করে পাথরটাকে।

ইঞ্চি চার-পাঁচেক পুরু একটাই পাথরের ঢাকনা, কিন্তু নড়ানো অসম্ভব। আবার ধাক্কাতে শুরু করে ওরা। ধাক্কায় গুম গুম করে একটা শব্দ উঠে আসছে। নির্ঘাৎ ভেতরটা ফাঁপা। উৎসাহে আরো জোরে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওরা ঠেলতে থাকে। রাজাবাবুও হাত লাগান এসময়।

অবশেষে ঢাকনাটা পিছলে খানিকটা সরে গেল। হ্যাঁ, একরাশ আবদ্ধ বাতাস যেন ওদের ওপর আছড়ে পড়ল।

রাজাবাবু উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন, খুলেছে, আর একটু সরালেই নামা যাবে।

উৎসাহে আবার ওরা এক সঙ্গে ধাক্কা মারে, আরো খানিকটা সরে গেল। হ্যাঁ, এবার নামা যেতে পারে।

রাজাবাবু আর অপেক্ষা করলেন না, স্বার্থপরের মতো নিজের শরীটাকে বাঁকিয়ে অন্ধকার গুহার মধ্যে নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে অরুণও, ব্রতীশও।

কোণাকুনিভাবে বিরাট একটা গর্তের মতো নেমে গেছে সুড়ঙ্গটা। এবড়ো খেবড়ো অসমতল। খানিকটা নামতেই ওরা বুঝতে পারল, সাবধানে পা না রাখলে পিছলে পাতালে চলে যাওয়ার ভয়।

কিন্তু রাজাবাবুর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, তরতর করে নেমে যাচ্ছেন। অরুণ ব্রতীশের দিকে অসহায়ভাবে তাকায়। ব্রতীশ চাপা গলায় উৎসাহ দেয়, থামিস না, আয়। সাবধানে আয়।

গা ছড়ে যেতে লাগল অরুণের, কিন্তু উপায় নেই। স্যাঁতসেঁতে পেছল পাথরগুলোকে জড়িয়ে ধরেই ও নামতে লাগল। কত নিচ অবধি এরকম নামতে হবে কে জানে!

রাজাবাবু বেশ খানিকটা নিচে নেমে হঠাৎ আবার একটু দাঁড়ালেন, কি হল হে তোমাদের? এসো।

অরুণ অসহায় গলায় বলল, একটু দাঁড়ান রাজাবাবু। পা পিছলে যাচ্ছে।

রাজাবাবু খনখনে গলায় হেসে উঠলেন, এই সামর্থ নিয়ে নীল টেম্পলে এসেছ! ওই ডাইনীটা হলে এতক্ষণ নীল ঝোরার মুখে পৌঁছে যেত।

আরো কিছুক্ষণ লাগল ওদের রাজাবাবুর কাছে পৌঁছতে। কাছাকাছি পৌঁছে ওরা বুঝতে পারল, এখানে সুড়ঙ্গটা বেশ চওড়া। তাছাড়া ঢালও অনেক কম। কিন্তু রাজাবাবুর কাছে পৌঁছে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা। কাছাকাছি কোথাও যেন একটা ঝরনা নেমেছে, ঝরঝর করে জল পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে।

রাজাবাবু আঙুল তুলে দেখালেন, সোজা এ রাস্তা ধরে তোমরা এগিয়ে যাও, খানিকদূর এগোলেই আবার কিছুটা ঢাল, তারপর নীল ঝোরার কাছে পৌঁছে যাবে।

ব্রতীশ থমকে দাঁড়াল, আপনি?

—আমার জন্য ভাবতে হবে না। গুহার ভেতর থেকে তোমরা বেরুতে চেয়েছিলে, সোজা এই পথে চলে যাও। নীল ঝোরটাকে ডিঙিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুখ করে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে উপরে উঠে যাও, নীল বাংলোয় পৌঁছে যাবে।

—আপনি?

রাজাবাবু খনখনে গলায় হেসে উঠলেন, আমার জন্য ভাবতে হবে না। যাও, এগোও তোমরা। বাইরে বেরুতে চেয়েছিলে না, এই পথ। বেরিয়ে যাও তাড়াতাড়ি।

অরুণ কেমন বোকার মতো তাকিয়ে রইল। রাজাবাবুকে এভাবে ছেড়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে! তা ছাড়া রাজাবাবু এই গুহার মধ্যে একা একা এখন কি করবেন? কি উদ্দেশ্য মাথায় ঘুরছে রাজাবাবুর!

ব্রতীশ ইশারা করল অরুণকে, আয়, রাজাবাবু যখন বলছেন, চল, আমরা ফিরেই যাই।

অরুণ কেমন দুর্বোধ্য চোখে তাকাল, বুঝতে পারল না, ব্রতীশ সত্যি সত্যি ওকে নিয়ে ফিরে যেতে চাইছে কিনা।

—আয় না। রাজাবাবুকে বিরক্ত করিস না, আয়। অরুণের হাত ধরে ব্রতীশ নিচের দিকে নামতে শুরু করে। তারই মাঝে একবার রাজাবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে ব্রতীশ বলল, আমরা কিন্তু বাংলোয় অপেক্ষা করব আপনার জন্য। আপনি যতক্ষণ না ফেরেন, অপেক্ষা করব রাজাবাবু।

রাজাবাবুর চোখদুটো যেন চকচক করে জ্বলছে, পালটা প্রশ্ন করলেন, কেন?

—কেন কি, আপনাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাব কলকাতায়। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পর আমাদের ছুটি।

—বটে। ঠিক আছে, দেখা যাবে। তোমরা এগোও।

ব্রতীশ অরুণের হাত ধরে আবার টানল, আয়। দাঁড়াস না।

তরতর করে বেশ কয়েক ধাপ ওরা মেমে এল। নেমে এসে ব্রতীশ ঝট করে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল, পেছন দিকে তাকাল, না রাজাবাবুকে আর দেখা যাচ্ছে না।

—কি হল? চাপা গলায় প্রশ্ন করে অরুণ।

ব্রতীশ পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে অরুণের হাতে ধরিয়ে দিল, যা, তুই একা নেমে যা এবার। সোজা বাংলোয় চলে যাবি। ইন্দর সিং আর রেখাকে যেভাবেই হোক আটকে রাখবি।

—আর তুই?

—আমি রাজাবাবুকে ফলো করব। আমার নির্ঘাৎ ধারণা, লোকটা এখন চিন্ময়ীর কাছে যাবে। যেখানেই যাক, লোকটাকে আমি নিয়েই ফিরব।

—কি করে বুঝলি ও বড় রাণীমার কাছে যাবে?

—সে সব তোকে পরে বলব, সময় নষ্ট করিস না। সোজা বাংলোয় চলে যা।

—আ না হয় যাচ্ছি, কিন্তু বাংলোয় যদি ওরা না থাকে?

—খোঁজ করে জেনে নিবি, বাংলোয় ফিরেছিল কিনা। যদি না ফিরে থাকে, তাহলে অপেক্ষা করবি, ওরা ফিরবেই। দরকার হলে আমাদের জিপ নিয়ে একবার সুন্দরগাঁও অবধি ঘুরেও আসতে পারিস। সুন্দরগাঁও হাঁটা পথে যাওয়া ছাড়া ওদের উপায় নেই। ফলে, মনে হয় ওদের পেয়ে যাবি। যা, আর দেরি করিস না, যা।

অরুণ তবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। ব্রতীশ বড় বড় পা ফেলে আবার ওপর দিকে রাজাবাবুকে ধরবার জন্য উঠতে শুরু করল।

খানিকটা ওঠার পর ব্রতীশ বুঝতে পারল ওর সন্দেহটা ভুল নয়। বাঁ-পাশে বিরাট একটা পাথর কাত করে এমনভাবে শোয়ানো যে

নামবার সময় বোঝার উপায় ছিল না, ওই পাথরের আড়াল দিয়ে আর একটা সুড়ঙ্গ নেমে গেছে। ব্রতীশ দেহটাকে বাঁকিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে দিল।

সুড়ঙ্গটা বেশ চাপা। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। তা ছাড়া সামনের দিকেই মনে হচ্ছে একটা বাঁক। সেই বাঁকের মুখে না এগোন পর্যন্ত বোঝা যাবে না, কোথায় চলেছে ও। দ্রুত সেই বাঁকের কাছাকাছি এগিয়ে আসে ব্রতীশ। এসে অবাক হয়ে দেখে, ধাপ ধাপ সিঁড়ি কাটা সুড়ঙ্গটা সটান ওপর দিকে উঠে গেছে। ওপরে বোধহয় খোলা আকাশ রয়েছে। একটু আলোর আভাও আছে বলে মনে হল ওর।

কিন্তু যার জন্যে এই সুড়ঙ্গে ঢোকা, সেই রাজাবাবুর নাম-গন্ধও নেই। লোকটা এই সুড়ঙ্গেই ঢুকেছেন তো! কেমন সন্দেহ হয় ওর। পরক্ষণেই মনে হয়, নির্ঘাৎ এখানেই ঢুকেছেন। এই সুড়ঙ্গের মুখেই সেই এলানো পাথরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন উনি। ওখান থেকেই ব্রতীশদের উনি বাংলোয় যেতে বলেছিলেন। নির্ঘাৎ এই সুড়ঙ্গেই ঢুকেছেন।

দু' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ব্রতীশ। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে ধীরে ধীরে। হঠাৎ চমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওই তো, ওই তো রাজাবাবু, সিঁড়ির শেষ মাথায় কুঁজো হয়ে হয়ে উঠছেন।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হল ব্রতীশ, যাক বাবা, হারিয়ে যায়নি তাহলে। ধীরে ধীরে ব্রতীশও উঠতে শুরু করে এবার।

আরো খানিকটা উঠে আবার একটু দাঁড়ায়, ধাপ ধাপ সিঁড়িটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! রাজাবাবুকে এখনো দেখা যাচ্ছে। আবছা ছায়ামূর্তির মতো, খুব ধীরে ধীরে উঠছেন উনিও। মাঝে মাঝে কি দাঁড়িয়ে পড়ছেন! ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো শরীরের দুর্বলতার জন্যই সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে ওঁর।

ব্রতীশ আরো খানিকটা এগোল। আবার থমকে দাঁড়াতে হল। মনে হচ্ছে, গুহার শেষ প্রান্তে গিয়ে রাজাবাবু কি যেন খুঁজছেন। কি খুঁজছেন ওখানে! দেয়ালে পাথর ঠুকছেন বলে মনে হল ওর।

কিন্তু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অপলক রাজাবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে ব্রতীশ।

আরো বেশ কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় কেটে গেল। হঠাৎ মনে হল, রাজাবাবু লাফিয়ে একপাশে সরে গেলেন। ঝরঝর করে বেশ খানিকটা মাটি আর পাথরগুঁড়ো গড়িয়ে পড়ল। পাথরের ছুটো একটা টুকরো গড়াতে গড়াতে ছুটে আসতে লাগল ব্রতীশের দিকে। সর্বনাশ! তীরের বেগে পাথর গড়ানো শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। অসহায়ভাবে যতখানি সম্ভব ছ'পা ফাঁক করে দাঁড়ায় ব্রতীশ। নাহ্, কপাল ভালো, পাথরগুলি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যে রকম বেগে ছুটে আসছিল, তাতে কোন একটা গায়ে লাগলেই আর দেখতে হত না। নেহাতই কপাল ভালো ব্রতীশের।

পাথর গড়ানো শব্দটা থামতেই ব্রতীশ আবার পা নামিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। ওদিকে রাজাবাবুও আবার খানিকটা এগিয়ে পুরনো জায়গায় ফিরে এলেন। ব্রতীশের পক্ষে কিছুই বোঝার উপায় নেই, কি করছেন উনি! মনে হল, আবার পাথর কুড়িয়ে নিয়েছেন। আবার ঠুকছেন। হ্যাঁ, আবার শব্দ হচ্ছে পাথর ঠোকার। অদ্ভুত শব্দে ভরে যাচ্ছে সুড়ঙ্গটা।

আরো কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর অভাবনীয় আর একটা কাণ্ড ঘটল। ব্রতীশ অবাক হয়ে দেখল, গুহার একটা অংশ যেন ফাঁক হয়ে পড়েছে। আলো ঢুকতে শুরু করেছে বাইরের।

রাজাবাবুকে এবার অনেকখানি পরিষ্কার দেখাচ্ছে। লোকটা সেই ফাঁকের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। হয়তো ওখান দিয়ে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বেশ আলো ঢুকছে ওখান দিয়ে।

ব্রতীশ আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, লোকটা বড় একটা

পাথরের চাইকে টেনে নামাবার চেষ্টা করছেন। সর্বনাশ, এ পাথরটাও যদি গড়াতে শুরু করে, নির্ঘাৎ মৃত্যু।

ব্রতীশের বুকের ভেতর গুরগুর করে কেঁপে উঠল। ও যে হাত কুড়ি পঁচিশ নিচে দাঁড়িয়ে আছে, রাজাবাবুর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। ফলে পাথরটাকে গড়িয়ে দিলে বা আপনি থেকেই পাথরটা গড়াতে শুরু করলে—নাহ্ ওর পক্ষে চুপ করে থাকা উচিত নয়।

ব্রতীশ চিৎকার করে উঠল, ও কী করছেন? রাজাবাবু—

শব্দটা প্রচণ্ড হয়ে উঠল গুহার ভেতরে। রাজাবাবু দু'পা পিছিয়ে আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পালটা চেঁচিয়ে উঠলেন, কে ওখানে?

—আজ্ঞে, আমি। একটু দাঁড়ান রাজাবাবু, আমি আসছি।

ব্রতীশ তরতর করে উপরে উঠে এল। একেবারে রাজাবাবুর কাছাকাছি।

—তুমি! রাজাবাবুর চোখে কেমন বিস্ময়। আবার এসেছ? কি চাও তুমি?

—আজ্ঞে, আপনাকে একা ছেড়ে দিতে সাহস হল না। তাই অরুণকে বাংলোয় পাঠিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

—বটে! রাজাবাবুর চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল। যেন উনি ওর গোপন কুঠরির সামনে এসে ধরা পড়ে গেছেন।

ব্রতীশ অপরাধীর মতো তাকাল, আমি কিন্তু আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই এসেছি। বিশ্বাস করুন, আর কোন উদ্দেশ্য নেই আমার।

—ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে। এদিকে এসো।

ব্রতীশ ধীরে ধীরে রাজাবাবুর কাছাকাছি আরো একটু এগোল।

—ওদিকে দেখ। ওই যে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওদিকে তাকাও।

ব্রতীশ একটু ঝুঁকে তাকাল। আশ্চর্য, আগুন জ্বলছে, কিসের আগুন ওটা!

—তোমরা সেই নীল টেম্পলের ভুতুড়ে আলো দেখেছিলে না বাংলো থেকে? মনে পড়ে?

ব্রতীশ হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

—ওটা সেই আলো। স্বামী শুদ্ধানন্দ নিজের জ্যোতি দিয়ে এই আলো জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, সেই আলো এখনো জ্বলছে। যতকাল সৃষ্টি থাকবে, এটা জ্বলবে।

ব্রতীশ ধীরে ধীরে বলল, ওটা তো গুহার মধ্যে জ্বলছে। বাইরে দেখা যায় কি করে?

—কি করে দেখা যায়, দেখবে? ওই আগুনের পাশ দিয়ে যে সরু জায়গাটা রয়েছে ছুটে পার হতে পারবে ওখান দিয়ে?

ব্রতীশ বোকার মতো তাকায়।

—সাহসে কুলোবে না তোমার। ঠিক আছে দেখ, রাজাবাবু আবার দেয়ালে সেই পাথরটা ঠুকতে শুরু করলেন। স্লেট পাথরের একটা ঢাকনার মতো কিছু যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওটাকেই নিচ থেকে বিরাট একটা পাথরের চাই বলে মনে হয়েছিল ব্রতীশের।

একটু সরে দেওয়ালের সঙ্গে নিজেকে সাঁটিয়ে দাঁড়ায় ব্রতীশ। ঢাকনাটা যদি ভেঙে পড়ে, ওকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। একটু সতর্ক হয়ে থাকে ও।

রাজাবাবু ঠোকা বন্ধ করে দু'হাতে পাথরটাকে টানতে শুরু করলেন, ব্রতীশ আর একটু এগোল, টানব। সরুন, আমি টানছি।

রাজাবাবু গ্রাহ্য করলেন না। পাথরটাকে ঠুকেই চললেন। আর এসময় বিশাল সেই পাতলা পাথরের ঢাকনাটা ঝুরঝুর করে ভেঙে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আশ্চর্য! বিরাট একটা ফোকর সৃষ্টি হয়ে গেল জায়গাটায়! এবার নীলাভ লকলক করা আগুনের শিখা আরো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল। কিসের আগুন ওটা!

তবে কী গুহারই কোন গোপন জায়গায় অফুরন্ত জ্বালানি গ্যাস জমা হয়ে আছে। আর সে জন্যই কী দীর্ঘকাল ধরে ওরকম শিখা মেলে জ্বলে চলেছে।

রাজাবাবু ব্রতীশকে গ্রাহ্য না করেই সেই ফোকরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, তারপর চকিতেই ছুটে গেলেন সেই আগুনের কাছাকাছি। ব্রতীশ চোখ ফেরাতে পারছিল না। দেখল, রাজাবাবু আগুনের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে সরু একটু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে ছুটে চোখের বাইরে মিলিয়ে গেলেন।

এবার! ব্রতীশ কেমন বোকা বনে গেল। রাজাবাবুকে নজরে রাখতে হলে ওরও এখন ছুটে এগিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু ওই আগুনের ওপাশে কি আছে কে জানে!

কি করবে ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্রতীশ। কিন্তু আগুনের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যা থাকে কপালে, ব্রতীশও জায়গাটা ছুটে পার হওয়ার জন্য তৈরি হল। তারপর দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল।

পায়ের নিচে মাটি তেতে গরম হয়ে আছে। দেয়াল থেকে প্রচণ্ড হলকা বেরুচ্ছে। দেয়ালে হাত ছোঁয়ানো উচিত নয়। ব্রতীশ মরীয়া হয়ে জায়গাটা পার হওয়ার জন্য আবার লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে লাগল। কয়েকটা ধাপ এগোবার পরই মনে হল, সামনে খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। ধাপ ধাপ কয়েকটা সিঁড়ি, তারপরই আকাশ। সিঁড়িটা প্রচণ্ড উত্তেজনায় পার হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ও গুহার ভেতর থেকে খোলা আকাশের নিচে আছড়ে পড়ল। আশ্চর্য, এ কী সেই নীল টেম্পলের মাথা ভাঙা সমতল ছাদ! হ্যাঁ, তাই হবে। চারপাশে কেবল বালি আর কাঁকর। এপাশে-ওপাশে বেশ কয়েকটা বড় বড় ফাটল। আর ওদিক সাত আট হাত দূরে একটা ফাটলের ফাঁক দিয়ে অল্পস্বল্প আগুনের জিভ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নীলাভ কাঁচের মতো আগুনটা লাফিয়ে উঠছে, আবার

গুহার মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তবে কী গতকাল সন্ধ্যায় বাংলোর বসে এই আগুনটাই দেখেছিল ওরা।

একটুক্ষণ সময় লাগল প্রকৃতিস্থ হতে। হঠাৎ খেয়াল হল, তাইতো রাজাবাবু কোথায় গেলেন! আগুনের পাশ দিয়ে প্রথমে রাজাবাবুই তো ছুটে বেরুলেন, তারপর—

ব্রতীশ উঠে দাঁড়াল। বহুদূরে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখা যাচ্ছে। নির্ঘাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা। বরফ আর মেঘে মাখামাখি হয়ে জায়গাটা কেমন রহস্যময়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা যদি ওদিকে হয়, নীল বাংলোটা তাহলে এদিকে হতে পারে। আরো একটু এগিয়ে বাংলোটাকে পাহাড়ের গায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করে ব্রতীশ। কিন্তু দূরের পাহাড়ের গায় জঙ্গল ছাড়া কিছুই নেই। কিছুই বোঝার উপায় নেই।

আরো একটু এগিয়ে মাথাভাঙা পাহাড়ের প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এল ব্রতীশ। হ্যাঁ, ওই তো বহু নিচে সেই নীলঝোরার স্রোত দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য রহস্যময় মনে হচ্ছে চতুর্দিক।

কিন্তু রাজাবাবু কোথায় গেলেন! আবার সেই গহ্বরের পাশে এগিয়ে এল ব্রতীশ। ঝুঁকে সেই সাংঘাতিক গর্তটার ভেতরে চোখ পাতল, ভাবা যায় না, এই গর্তের ভেতর দিয়েই ওরকম একটা সুড়ঙ্গ পাতাল অবধি নেমে গেছে, আর সেই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়েই জীবনের সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে ও এখানে উঠে এসেছে।

তবে কি রাজাবাবু ওকে ফাঁকি দিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন। ব্রতীশ গহ্বরের দিকে মুখ রেখে ডেকে উঠল, রাজাবাবু—

শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। ব্রতীশ আবার ডাকল, আপনি কোথায় রাজাবাবু? শুনছেন?

এবারও কোন উত্তর নেই। ব্রতীশ কেমন হতাশ চোখে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকাল। এখন মধ্য দুপুর। কিন্তু বাতাসটা

কেমন কনকনে ঠাণ্ডা। একদিকে লকলকে পাতলা আগুনের জিভ। অন্য দিকে তেমনি হিমালয়ের ঠাণ্ডা হাওয়া।

আবার উঠে দাঁড়ায় ব্রতীশ, এভাবে এখানে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হচ্ছে না। ওদিকে বাংলোয় ফিরে গিয়ে অরুণ একা এখন কি করছে কে জানে! ড্রাইভার ভূষণ সিং যদি গাড়ি নিয়ে না এসে থাকে, তাহলে সত্যি সত্যি ও ঝামেলায় পড়বে। তাছাড়া রেখা বা ইন্দর সিংয়ের মাথায় কি আছে তাই বা কে বলবে!

ব্রতীশ আবার গুহায় নেমে পড়বে কিনা ঠিক করতে পারছিল না। গুহার ভিতর দিয়ে ছাড়া অন্য কোন রাস্তাও আছে মনে হচ্ছে না। মাথাভাঙা পাহাড়টার চারপাশেই কেমন খাদ। এই খাদ ধরে নিচে নামা অসম্ভব।

ব্রতীশ আবার গর্তের ভেতর ঝুঁকে দাঁড়াতেই চমকে উঠল, ওই তো, ওদিকে গুহার ভেতর হুমড়ি খেয়ে কি করছেন রাজাবাবু!

ব্রতীশ চেঁচিয়ে উঠল, রাজাবাবু—

লোকটা গরমে আর ঘামে কেমন কাদামাখা হয়ে গেছেন। ব্রতীশের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন, তারপর চকিতেই আবার নিজেকে আড়াল করার জন্য আর একটু সরে গেলেন।

কেমন সন্দেহজনক ভঙ্গি। ব্রতীশ আবার হুট করে গর্তের ভেতর নেমে পড়ল, সেই গুহা।

ধাপ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা নামতেই আবার রাজাবাবুকে দেখা গেল। সেই নীলাভ পাতলা কাঁচের মতো আগুনের সামনে দু'হাত তুলে অদ্ভুত ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছেন। কি করছেন ওখানে!

ব্রতীশ আর ডাকল না। আরো একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াল, রাজাবাবুর হাতে চৌকো মতো একটা বস্তু, ভেলভেট কাপড় দিয়ে জড়ানো একটা পুটলির মতো। কি ওটা!

চট করে মনে হল, স্বামী শুদ্ধানন্দের সেই পুঁথিটা নয় তো। কিন্তু ওটা কি উনি আগুনে ফেলে দিতে চাইছেন!

কেমন অস্বস্তি বোধ করে ব্রতীশ। সত্যি সত্যি যদি পুঁথি হয়, কতকালের পুরনো পুঁথি কে জানে! যাই থাক না ওই পুঁথিতে, নষ্ট করে ফেলা কি উচিত হবে! রাজাবাবুকে যেভাবেই হোক বাধা দেওয়া দরকার।

ব্রতীশ আবেগ মিশিয়ে আপনজনের মতো ডেকে উঠল, রাজাবাবু শুনছেন? গলায় কেমন অনুনয়।

রাজাবাবু মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন, এসে গেছ! আমি জানতাম কিছুতেই আমার পেছু ছাড়বে না তোমরা। আবার মুখ ফেরালেন।

—ওখানে কি করছেন রাজাবাবু? চলুন, আমরা ফিরে যাই।

খনখনে গলায় হেসে উঠলেন রাজাবাবু, যাবো তো বটেই, তবে যাবার আগে শুদ্ধানন্দের জ্যোতির কাছে এটাকে আহুতি দিয়ে যাবো। তোমরা যাতে কেউ এই গুপ্ত পুঁথির সন্ধান না রাখতে পার, তার বন্দোবস্ত করে যাবো। একটু দাঁড়াও।

ব্রতীশ নিঃসন্দেহ হল, ওটা পুঁথিই, কি ছেলেমানুষী করছেন রাজাবাবু? দয়া করে নষ্ট করবেন না। আপনার জিনিস আপনার কাছেই না হয় রাখুন, নষ্ট করবেন না। দোহাই আপনার।

আবার অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন রাজাবাবু, স্বামী শুদ্ধানন্দ আজ থেকে কত যুগ আগে এই পুণ্য জ্যোতি এখানে জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর সেই অমূল্য পুঁথি তাঁর কাছেই রেখে যাবো। দেববর্মন পরিবারের গোপন বিদ্যা কিছুতেই বাইরে বেরুতে দেওয়া যায় না।

ব্রতীশ দেখল, লোকটা সেই ভেলভেট কাপড়ের পুটলিটা নিয়ে শিখার তালে তালে যেন নাচছেন। আশ্চর্য, অদ্ভুত খ্যাপাটে মানুষ রে বাবা!

কিন্তু যেভাবেই হোক পুঁথিটাকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। ব্রতীশ চোরের মতো পা টিপে টিপে এগোতে থাকে। আর মাত্র সামান্য কয়েকটা হাত। এখনি ইচ্ছে করলে লাফিয়ে পড়া যায় লোকটার ওপর। কিন্তু—

একটু থমকে দাঁড়াল ব্রতীশ, রাজাবাবু, শুনছেন? আবার ডাকল।

রাজাবাবু কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগুনের সামনে তখনো নাচছেন। অদ্ভুত পাগল পাগল ভঙ্গি। সত্যিকার পাগলই হয়ে গেলেন নাকি!

ব্রতীশ ঝট করে লাফিয়ে রাজাবাবুর কোমর জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নাটকীয় ঘটনাটা ঘটে গেল। সাপের ছোবল খাওয়া মানুষের মতো যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন রাজাবাবু। হাতের সেই রহস্যময় পুঁথিটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। গুহার দেয়ালে বার দুয়েক আঘাত খেয়ে ঘুরপাক খেতেই আগুনের শিখা তাকে ধারালো জিভ মেলে টেনে নিল নিজের গহ্বরে।

—ফেলে দিলেন! ককিয়ে উঠল ব্রতীশ।

রাজাবাবু ঘাড় গুঁজে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর মাথা তুললেন, কেমন হতাশ ভেঙে পড়া চেহারা, চলো, কোথায় যেন নিয়ে যেতে চেয়েছিলে আমাকে, চলো এবার।

ব্রতীশ কথা খুঁজে পেল না। অপরাধীর মতো রাজাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন।

পরের ঘটনা খুবই সামান্য, রাজাবাবুকে নিয়ে ব্রতীশ যখন ডাক বাংলোয় এসে হাজির হল, তখন ঘড়িতে প্রায় তিনটে। সারাদিন ওরা না খাওয়া, তবু ক্ষুধা-ক্লান্তির কথা যেন ওদের মনে ছিল না। ব্রতীশ বাংলোয় পৌঁছবার মুখেই দূর থেকে দেখতে পেল, বাংলোর সামনে খান দুয়েক জিপ, কয়েকজন লোক সেখানে ঘোরাফেরা করছে। কে রে বাবা, কারা ওরা! তবে কি নতুন টুরিস্ট এল। কিন্তু না, আরো কাছাকাছি হতেই ব্রতীশ চিনতে পারল ওদের। উৎসাহে চিৎকার করে উঠল, এই যে শ্যাম, এসে গেছিস!

কার্শিয়ং থানার ও-সি সেই শ্যাম মুখার্জি কেবল একাই নয়, একটা ছোটখাট ফোর্স নিয়েই হাজির হয়েছে বাংলোয়। হাতে যেন স্বর্গ পেল ব্রতীশ, অরুণ কোথায়? ফেরেনি?

শ্যাম আঙুল তুলে দেখাল, ওই তো ওদের সঙ্গে বসে আছে। তোর এত দেরি হল? আমরা চিন্তায় পড়ে যাচ্ছিলাম।

ব্রতীশ হাসল, আয় শ্যাম, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি সেই রাজাবাবু, দনুজদলন। নীল টেম্পলের হত্যা-কর্তা-বিধাতা।

শ্যাম হাত তুলে নমস্কার জানাল, কিন্তু রাজাবাবু বিন্দুমাত্র পাত্তা দিলেন না। সমস্ত শরীরটা ওর ভাঙাচোরা, কেমন বিধ্বস্ত যেন।

ব্রতীশ শুধাল, রেখাদেবী কোথায়? কী ডেঞ্জারাস মহিলা মাইরি!

শ্যাম বলল, সব শুনেছি। ভাগ্যিস আমি আগেভাগেই এসে হাজির হয়েছিলাম, অরুণবাবুর মুখে সব শুনেছি। চল, ওদিকে বসিয়ে রেখেছি ওদের।

ওরা বাংলোর সেই চার নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে এল। চার নম্বরের দরজায় একজন আর্মড পুলিশ। হাত তুলে সেলাম ঠুকল ওদের।

শ্যাম বলল, ওরা ঘরেই রয়েছে, চল।

ঘরে ঢুকতেই প্রথমে অরুণকে দেখতে পেল ব্রতীশ, হাতে সেই রিভলবার। আর ওপাশে সোফায় সেই দু'জন, ইন্দর সিং আর রেখাদেবী। কিন্তু আশ্চর্য, চোখেমুখে কোন উত্তেজনা বা অপরাধ-বোধের চিহ্নই নেই।

ব্রতীশকে দেখতে পেয়েই ইন্দর সিং উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অরুণও লাফিয়ে উঠল, দাঁড়াবেন না. বসুন। যা বলার বসে বসেই বলুন।

আবার বসে পড়ল ইন্দর সিং, আমাদের ওপর এভাবে জুলুম করছেন কেন? কি করেছি আমরা?

ব্রতীশ এগিয়ে এল ইন্দরের কাছে, আপনার স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করুন না, কি করেছেন !

রেখা চোখ তুলে তাকাল, কি করেছি ? টুরিস্ট হিসেবেই আমরা এখানে এসেছিলাম, টুরিস্ট হিসেবেই আমরা এখান থেকে চলে যেতে চাই।

—বড় রাণীমার দেহটা পাচার করে কোথায় রেখেছেন ? সবুট মেঝের ওপর ঠুকে প্রশ্ন করল ব্রতীশ।

—কী বলছেন ! আমরা ও-সব কিছুই জানি না।

—জানেন না। রাজাবাবুকে এক বছর ধরে ওই অন্ধকার গুহায় আটকে রাখেন নি আপনারা ?

—বাজে কথা। রাজাবাবু টাজাবাবু কাউকেই আমরা চিনি না। তবে হ্যাঁ, আমরা নীল টেম্পলে বেড়াতে যেতাম, ওখানকার গুহার ভেতর ঘুরে বেড়াতেও আমাদের ভাল লাগত।

ব্রতীশ আরো হু'পা এগিয়ে অরুণের হাত থেকে রিভলবারটা তুলে নিল। তারপর রেখার দিকে রিভলবার নাচিয়ে বলল, দিন আপনাদের স্যুটকেসের চাবি দিন. আমরা সার্চ করব।

—কে আপনারা যে চাইলেই চাবি দিতে হবে। ওয়ারেণ্ট আছে ?

—আছে কি নেই সেটা পরে বুঝবেন, আগে চাবি দিন। ধমকে উঠল ব্রতীশ।

এমন সময় রাজাবাবুও এসে দরজার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন, চেঁচিয়ে উঠলেন, ডাইনী ! এই তো সেই ডাইনী !

রেখাদেবীর চোখে তবু কোন উত্তেজনা নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করল, এ কে ? কি সব পাগলের পাল্লায় পড়লাম আমরা।

—পাগলের পাল্লায় পড়েছেন, না ? কাউকেই চিনতে পারছেন না, তাইতো ?

হঠাৎ একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে বসল ব্রতীশ, ইন্দর সিংয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে ঝট করে ওর চিবুক ধরে একটা হ্যাঁচকা টান

মারল। যা আশা করেছিল তাই ঘটে গেল, নকল দাড়িই কেবল নয়, মাথার পরচুলাটাও খুলে এল।

চমকে উঠল অরুণ, এ মুখ ওর বেশ চেনা। আশ্চর্য! চেঁচিয়ে উঠল ও, তারাপদবাবু আপনি! আপনি কখন এলেন?

রাজাবাবু হো হো করে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন, চেন নাকি তারাপদকে! আর ওকে চেন না? ডাইনীটাকে?

ব্রতীশরা তাকিয়ে থাকে।

রাজাবাবু বললেন, চিনবে কি করে, ওকে অত সহজে কেউ চিনবে না। তারাপদকে ওই তো চালায়। তারাপদর সাহসে কুলোয় নি, আমার কাছে এগোয়, কিন্তু ওকেই পাঠিয়ে দিত রোজ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রাজাবাবু। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করলেন, শুদ্ধানন্দের সেই পুঁথির জন্য বছর খানেক ধরে ঘুমুলি না তারাপদ, আমাকেও ঘুমুতে দিলি না। আজ কিন্তু আমার আর কোন দুশ্চিন্তা রইল না। আজ আমি প্রাণভরে ঘুমোব। উহ্ কতকাল ঘুমুই নি। বলতে বলতে একরকম প্রায় কেঁদেই উঠলেন রাজাবাবু।

অরুণ এগিয়ে এসে রাজাবাবুকে একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল। আপনি বসুন।

রাজাবাবু আবার ককিয়ে উঠলেন, কিন্তু কি লাভ হল তোদের? বিশ্বাসঘাতক, কি ফায়দা হল তোদের? চিন্ময়ীকে তোরা সরিয়ে নিয়ে গেলি, কিন্তু চিন্ময়ী যে অহরহ আমার কাছেই ছুটে আসত, সে খবর তোরা পাবি কি করে! আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন রাজাবাবু।

—বড় রাণীমার বডিটা কোথায় রেখেছেন? আবার বুট ঠুকে প্রশ্ন করে ব্রতীশ।

তারাপদ বা রেখা দু'জনেই কেমন নিরব।

রিভলবারটা তারাপদর চিবুকে চেপে ধরে ব্রতীশ, কোথায়? কোথায় রেখেছেন?

—নেই। ধীরে ধীরে উত্তর করল তারাপদ।

—নেই মানে?

—রিভলবার সরান, বলছি।

ব্রতীশ রিভলবার সরিয়ে নিল।

তারাপদ মাথা নিচু করে বলল, বডিটা আমরা সরিয়ে নিয়েছিলাম কেন জানেন? রাজাবাবুর এ-সব পাগলামী আমরা সহ্য করতে পারি নি, তাই। একটা মাথা খারাপ লোককে বেশি দূর এগোতে দেওয়া কি উচিত? আপনারাই বলুন না!

—বডিটা সরিয়ে নিয়ে কোথায় রাখলেন?

—নীল টেম্পলের গুহাতেই অন্য এক জায়গায় সরিয়ে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, বডিটার সৎকার করার ব্যাপারে রাজাবাবুকে রাজি করানো যাবে। কিন্তু—

রাজাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। ওরা আমার কাছ থেকে শুদ্ধানন্দের পুঁথিটা আদায় করতে চেয়েছিল। ভেবেছিল ওটা দিয়ে ওরা মৃত্যুরহস্য জেনে নেবে। ভেবেছিল চিন্ময়ীকে আমি কিভাবে জীবন্তের মতো রেখেছি তা ওরা শিখে নেবে।

—বডিটা সরিয়ে রাখলেন, সেটা কি আবার ফিরে পাওয়া যায় না তারাপদবাবু? কোথায় রেখেছেন বডিটা?

তারাপদ আবার বলতে শুরু করল, মাস দুয়েক যেতে না যেতেই বডিটার গায়ের রং কেমন হলুদ হয়ে যেতে শুরু করেছিল। আমরা ভয় পেয়ে রাণীমাকে সৎকার করে ফেলেছি।

—কি ভাবে করলেন? পুড়িয়েছেন, না মাটি চাপা দিয়েছেন?

—না কোনটাই না। বডিটাকে নীল টেম্পলের মাথায় তুলে রেখে এসেছিলাম। ওখানে ফাটলের ভিতর দিয়ে যে আগুনের জিভ লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে তা নিশ্চয়ই দেখেছেন?

—আমরা ওই আগুনের গহ্বরেই বড় রাণীমাকে রেখে এসেছিলাম। ভগবানের কাছে ওর সংগতি প্রার্থনা করেছিলাম।

অবিশ্বাস করার নয়। ব্রতীশের চোখের ওপর ভেসে উঠল সেই আগুনের শিখা। শুদ্ধানন্দের পুঁথিটাও এতক্ষণে না জানি ছাই হয়ে গেছে ওখানে।

শ্যাম বলল, ভাগ্যিস আমার সন্দেহ হওয়ায় ফোর্স নিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছিলাম।

ব্রতীশ হাসল, আমি জানতাম তুই আসবি। রহস্যের গন্ধ পেলে কে বাপু ঘরে বসে থাকতে পারে। যাক গে, এবার ফেরার বন্দোবস্ত কর দেখি। পথে সুন্দরগাঁওতে না হয় কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।

অরুণ বলল, ওদের হ্যাণ্ডকাপ পরাবার দরকার নেই, এমনিই গাড়িতে তোলা যাক। কার্শিয়ং অবধি নিয়ে গিয়ে তারপর যা করার করা যাবে।

ব্রতীশ রেখার দিকে তাকাল, কি, উঠুন এবার! আর কেন! বাকি যা ঘটার সে তো কোর্টেই ঘটবে। উঠুন। রিভলবারের বাট দিয়ে তারাপদর কাঁধে একটা টোকা মারল ব্রতীশ।

———